বন্যা মোকাবেলায়
পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতি সহায়িকা

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য

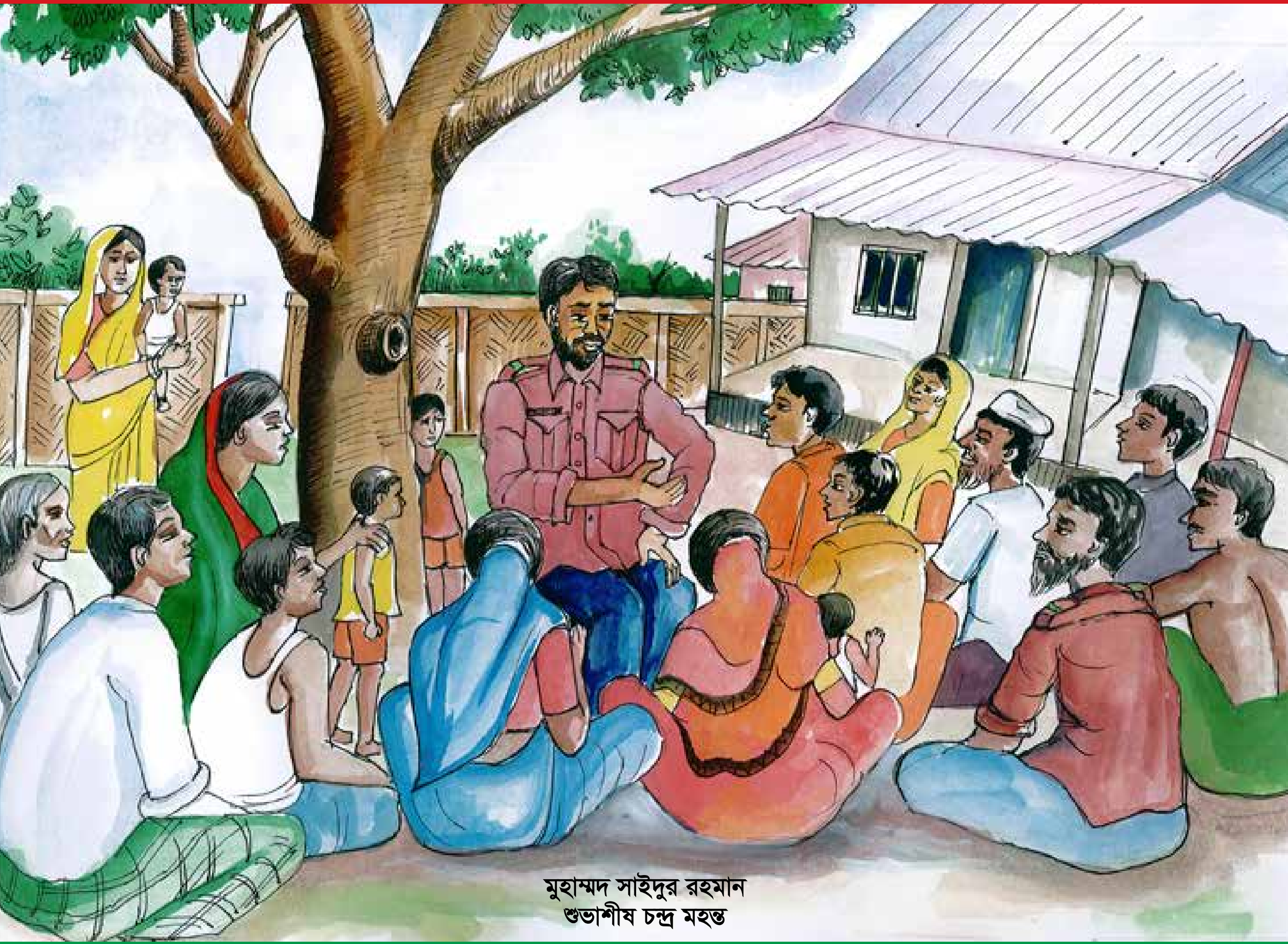

মুহাম্মদ সাইদুর রহমান
শুভাশীষ চন্দ্র মহন্ত

প্রকাশনা:
বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

কারিগরি সহযোগিতা:
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস্ সেন্টার (বিডিপিসি)

অর্থায়নে : কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি২)

UKaid from the British people
European Union
NORWEGIAN EMBASSY
SWEDEN
Australian Aid
UNDP Empowered lives. Resilient nations.

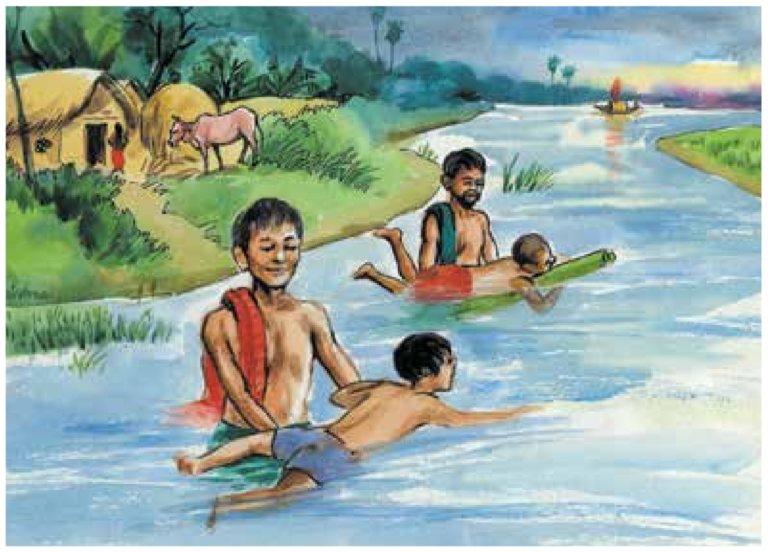

ধারণা ও নির্দেশনা
মুহাম্মদ সাইদুর রহমান

উন্নয়ন ও সম্পাদনা
শুভাশীষ চন্দ্র মহন্ত

গ্রাফিক ডিজাইন
ডট্‌নেট লিমিটেড, ৫১-৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা

মুদ্রণ

প্রকাশকাল
২০১৪

প্রকাশনা
বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

কারিগরি সহযোগিতা
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (বিডিপিসি)

অর্থায়নে
কম্প্রিহেনসিভ ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি - ২)

বন্যা মোকাবেলায়
পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতি সহায়িকা

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য

বাণী

মন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পলিবাহিত বিস্তীর্ণ এক সমতল ব-দ্বীপ। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রায়ই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। এসব ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, নদীভাঙ্গন, খরা ইত্যাদি। কিছুদিন পরপর এ ধরনের নিয়মিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে এদেশে ব্যাপক জানমালের ক্ষতি হচ্ছে। একারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিগণিত।

১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (সিপিপি) চালু করেন যা আজও উপকূলীয় বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে সাইক্লোন এর কবল থেকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে সচেষ্ট। সিপিপির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ও কারিগরি সহায়তার জন্য বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (বিডিপিসি) - কে সাথে নিয়ে কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২) গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় বন্যা দুর্গত অঞ্চলের মানুষের কাছে সতর্কতা বার্তা পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে "ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম" বাস্তবায়ন করছে যেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমাদের দেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে; তথাপি জলবায়ু পরিবর্তন সহ জনসংখ্যার আধিক্য, নানাবিধ প্রতিকুলতা এবং দুর্যোগের সংখ্যা ও প্রকৃতির ক্রমবর্ধমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের আত্মতুষ্টির কোন সুযোগ নেই। আমাদেরকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার অগ্রযাত্রা সমুন্নত রাখতে হবে।

আমি আশা করবো গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জ জেলার বন্যা মোকাবেলায় প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা দেশের বন্যা দুর্গত অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তৃত করা হবে এবং বন্যার হাত থেকে দেশের মানুষ, মানুষের জীবিকা ও সম্পদ রক্ষার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

পরিশেষে ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য সিডিএমপি এবং বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সাধুবাদ জানাচ্ছি, এবং এ কার্যক্রমের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (বীর বিক্রম, এমপি)

বাণী

জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট
প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

নদী মাতৃক বাংলাদেশে প্রতিবছর বন্যা একটি নিয়মিত ঘটনা। আমাদের দেশে সংঘটিত বন্যার প্রকৃতি এক নয়, এদেশে বন্যা কখনো স্বল্পমাত্রায়, কখনো অধিক মাত্রায় আবার কখনো স্বল্পমেয়াদি, কখনো দীর্ঘমেয়াদি। কখনো কখনো এদেশের মানুষের জন্য বন্যা হয়ে ওঠে প্রচন্ড বিধ্বংসী, তছনছ হয়ে যায় মানুষের স্বাভাবিক জীবন, যার প্রমাণ মেলে ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮ এর মত ভয়াবহ বন্যায়। একটি বিষয়ে সবাই একমত হবেন যে, অবস্থান গত কারণেই আমাদের পক্ষে বন্যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু বন্যা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যার ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা অনেকাংশে কমানো সম্ভব। আর এর জন্য প্রয়োজন বন্যার পূর্বে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের কার্যকরী প্রস্তুতি।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র প্রতিনিয়ত বন্যার পূর্বাভাস তৈরি ও সীমিত পরিসরে প্রচারের কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু এখনো মাঠ পর্যায়ে জনগনের নিকট পৌছানোর ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সফলতা অর্জিত হয়নি। জাতীয়ভাবে বন্যা পূর্বাভাসে যে ভাষা এবং একক ব্যাবহার করা হয় তা সবসময় প্রান্তিক পর্যায়ের বিপদাপন্ন জনসাধারণের জন্য বোধগম্য হয়না। এ কারণে বন্যা পূর্বাভাসকে স্থানীয়দের বোধগম্য ভাষায় প্রচার ও তাদেরকে বন্যা পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২), বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থাকে স্থানীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠিকে বন্যা পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাধ্যমে বন্যা প্রবণ দুটি জেলা সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধায় ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির কারিগরী সহায়তা দিচ্ছে বাংলাাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (বিডিপিসি)। আমার বিশ্বাস কর্মসূচিটি বন্যা পূর্বাভাস স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকরীভাবে প্রচারে ও জনসাধারণের বিপদাপন্নতা হ্রাসে বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও এ বাহিনীর গ্রাম পর্যায়ের দক্ষ কর্মীবৃন্দ যাদের সফল অংশগ্রহনই এই কর্মসূচির প্রধান চালিকা শক্তি তাদের সহ এই কর্মসূচির সাথে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং এ কর্মসুচির সফলতা কামনা করি ।

মোহাম্মাদ আবদুল কাইয়ুম

বাণী

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ বন্যা প্রবণ একটি দেশ। বন্যা যেন এদেশের মানুষের কাছে একটি নিত্য নৈমিত্য ব্যাপার। যার সঙ্গে নিত্য বসবাস সেই বন্যাই কখনো কখনো এদেশের মানুষের কাছে হয়ে ওঠে বিধ্বংসী যার উদাহরণ স্প্রাতিককালে ১৯৮৭, ১৯৮৮,১৯৯৮ এর ভয়াবহ বন্যা। বাংলাদেশ সরকারের সুত্র অনুযায়ী শতাব্দীর ভয়াবহ ১৯৯৮ সালের বন্যায় দেশের ৭৫%ভূভাগ প্লাবিত হয়েছিল যার মাধ্যমে ৩০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, ২৫ মিলিয়ন মানুষ গৃহহীন হয়েছে, গৃহপালিত পশু হারিয়েছে ২৬,০০০, ফসল নষ্ট হয়েছে ৫৭৫,০০০ হেক্টর জমির, ৩০০,০০০ নলকূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, প্লাবিত হয়েছে ১৬,০০০ কিলোমিটার রাস্তা, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ৪৫০০ কিলোমিটার নদীর বাঁধ ।

বন্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, কিন্তু এর ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা কমানো সম্ভব। বন্যার ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে বন্যা পরবর্তী সময়ে ত্রাণ বিতরনের চেয়ে বন্যার পূর্বে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের প্রস্তুতি যে অনেক বড় ভূমিকা রাখে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

আমাদের দেশে বন্যার ক্ষয় ক্ষতি কমাতে বন্যা পূর্বাভাস/সতর্ক সংকেত তৈরি ও প্রচারে FFWC নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা প্রসংশার দাবিদার হলেও বাস্তবতার নিরীখে সেখানেও রয়েছে ভনেক সীমাবদ্ধতা। কারণ জাতীয়ভাবে বন্যা পূর্বাভাসে যে ভাষা এবং একক ব্যাবহার করা হয় তা সবসময় গ্রামীণ পর্যায়ের নিরক্ষর জনসাধারণের জন্য বোধগম্য হয়না এবং কার্যকর ভূমিকাও রাখেনা। এর জন্য প্রয়োজন পূর্বাভাসকে স্থানীয় ভাষায় রূপান্তর করে তাদের বোধগম্য করে প্রচার করা। যা তাদের বন্যা পূর্ব প্রস্তুতিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

দুর্যোগ সহ দেশের যেকোন ক্রান্তিকালে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি সাড়া দিয়ে আসছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতেই বন্যার ক্ষয় ক্ষতি কমাতে CDMP- র আর্থিক BDPC- র কারিগরী সহযোগিতায় দেশের অত্যন্ত বন্যাপ্রবণ দুটি জেলা সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধায় বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি বাস্তবায়ন করছে ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (এফপিপি)। । নিয়মিত কাজের বাইরে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব, আনসার ভিডিপির দায়বদ্ধতা ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের বিশেষ অংশীদারিত্বের সুযোগ তৈরি করেছে

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো আনসার ভিডিপির স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামের ভাষায় বন্যার সংবাদ তৈরি ও প্রচার এবং উঠান বৈঠক সহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে বন্য পূর্বপ্রস্তুতি সচেতনতা সৃষ্টি।

উঠান বৈঠকে আলোচনার উপকরণ হিসেবে এই প্রকল্পের অধীনে প্রস্তুত করা হয়েছে এই হ্যান্ডবুক এবং ফ্লিপচার্ট যা স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব পালনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি এই কর্মসুচির সার্বিক সাফল্য কামনার পাশাপাশি এর অংশীদার হওয়ার জন্য সকলকে আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি।

মেজর জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দিন

ভূমিকা

পৃথিবীর মানুষের কাছে যে সমস্ত কারণে বাংলাদেশ খুবই পরিচিত, তার অন্যতম হলো বন্যা। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে এ দেশে প্রতি বছরই কোনো না কোনো অঞ্চলে ছোট, মাঝারি বা বড় আকারের বন্যা হয়ে থাকে। বর্ষা মৌসুমে এ দেশের ব্যাপক জলরাশির প্রায় ৯৫ ভাগ পানি আসে দেশের বাইরে ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীন থেকে। আর এই পানি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে গিয়ে পড়ে বঙ্গোপসাগরে। এমতাবস্থায় বন্যা থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি কমাতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথা না ভেবে আমাদের বেশি করে ভাবা উচিত এই বন্যা থেকে মানুষ কিভাবে নিজেই নিজের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি কমাতে পারে তা নিয়ে।

বাংলাদেশের সরকারি, অসরকারি প্রতিষ্ঠান, দাতাসংস্থা সকলেই এক সময় মনে করতেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান কাজ দুর্যোগ চলাকালে ও পরবর্তীতে রিলিফ ও পুর্নবাসন। কিন্তু ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যা এ ধরনের ভাবনাকে পাল্টে দিয়েছে। ঘুর্ণিঝড়ের মতো বন্যায় ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে না এ কথা সত্য। কিন্তু বন্যার কারণে দেশের অর্থনীতিতে দীর্ঘ মেয়াদী যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, পরোক্ষ ভাবে তার ফলাফল ভোগ করতে হয় এ দেশের প্রতিটি জনগণের। আর প্রত্যক্ষ ভাবে বন্যা কবলিত এলাকার অধিকাংশ মানুষ সহায় সম্বল হারিয়ে ভূমিহীন হওয়ার ঘটনা এ দেশের কোনো মানুষের অজানা নয়।

এ রকম একটি বাস্তব পরিস্থিতিতে বিডিপিসি বিশ্বাস করে বন্যাপ্রবণ এলাকার প্রতিটি পরিবারকে যদি বন্যা মোকাবেলায় আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলা হয় এবং তাদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা জাগিয়ে রাখা যায়, তবে তা অবশ্যই বন্যা মোকাবেলায় একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। আর সেই উদ্দেশ্যেই এই সহায়িকা রচনা করা হয়েছে। এই পুস্তিকাটি মূলতঃ ব্যবহার করবেন বন্যাপ্রবণ এলাকার ব্যক্তিবর্গ যেমন-আনসার ও ভিডিপি'র স্বেচ্ছাসেবক ,ইমাম, শিক্ষক, সরকারি, অসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, সাংস্কৃতিক কর্মী, এনজিও গ্রুপ লিডার, সমাজসেবী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ।

সামাজিক দায়িত্ববোধের আলোকে এই স্বেচ্ছাসেবক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই পুস্তিকার সাহায্যে বন্যা মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বন্যাপ্রবণ এলাকার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন।

বন্যাপ্রবণ এলাকার মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি কমাতে আমাদের (সিডিএমপি,আনসার ও ভিডিপি,বিডিপিসি) এই প্রয়াস-বাংলাদেশের বন্যা মোকাবেলায় পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে এবং স্থায়ী রুপ লাভ করবে এটাই আমাদের বিশ্বাস।

মুহাম্মদ সাইদুর রহমান

পরিচালক

বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার

সহায়িকা সম্পর্কে কিছু কথা

বাংলাদেশ প্রায় সমতল ভূমির দেশ। এ দেশে আছে অসংখ্য নদী। সে সব নদীর উৎস হিমালয়। হিমালয়ের সুউচ্চ স্থান থেকে নেমে, আঁকাবাঁকা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নদীগুলো বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশে। জলরাশির সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমার মাধ্যমে আমাদের নদীর তলদেশ অনেক আগেই পলি মাটিতে ভরে উঠেছে। তাতে নদীর নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে ভয়ানক ভাবে। যে বছর হিমালয়ের জল প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, সে বছর বাংলাদেশে বন্যা হয়ে থাকে। বাড়তি পানি দ্রুত নেমে যাওয়ার পথ সংকীর্ণ হওয়ায় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে উপকূল অঞ্চলসহ দেশের যে কোনো স্থান বন্যাক্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অভিন্ন কারণে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এ সব দুর্যোগও সংঘটিত হতে পারে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ জীবন বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। মানুষ সুপ্রাচীন কাল থেকে কোনো না কোনো দুর্যোগ বা বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে। হযরত নুহ নবীর সময়ে যে মহাপ্লাবন হয়েছিল, ঐতিহাসিক ভাবে সত্য সে ঘটনা সর্বজাতি বিদিত। একই ভাবে গত তিন দশকে বাংলাদেশে ব্যাপক ভাবে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো গোটা পৃথিবীর দৃষ্টি কেড়েছিল।

মানুষের জীবন প্রবাহে সুখ-অসুখ, উত্থান-পতন, সফলতা-ব্যর্থতার অনুঘটন যেমন আছে, তেমনি তার প্রতিকার ও পরিত্রাণও আছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনার চরম দুর্দিনে হিলফুল ফুজুল দল গঠন করে মদীনাবসীদের বহু ভাবে সাহায্য করেছিলেন। সেটা ছিল মূলতঃ বিপদে-আপদে সাহায্য, সাহসিকতা, ধৈর্য্য, সময়োপযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিপদকে মোকাবিলা করার ফলপ্রসূ দৃষ্টান্ত।

আমরা দেশবাসী, বিশেষতঃ দুর্যোগ প্রবণ এলাকার আপামর জনসাধারণ বন্যাসহ বিভিন্ন দুর্যোগের ধরন ও প্রকৃতি অনুসারে তা মোকাবিলার পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের ঘরবাড়ি, সহায় সম্পদসহ জীবন রক্ষা করতে পারি। সে ক্ষেত্রে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

এই সহায়িকাটি দেশের বন্যাপ্রবণ এলাকার আনসার ও ভিডিপি স্বেচ্ছাসেবক, শিক্ষক, শিক্ষিকা, সমাজসেবী, চেয়ারম্যান, মেম্বার, এনজিও কর্মী, ইমাম, ধাত্রী, স্বেচ্ছাসেবকসহ সকল শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য রচনা করা হয়েছে। তারা সমাজের সাধরণ মানুষকে দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতন করার কাজে সহায়ক হবেন বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

কেননা সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে তাদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রয়েছে এবং সমাজের সাধারণ মানুষও তাদের কথা শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনা করে থাকেন।

কিছু ব্যক্তি আছেন যারা পেশাগত কারণে সুনির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের কাজ করে থাকেন, মসজিদের ইমাম সাহেব প্রত্যেক শুক্রবারে জুম্মার নামাজে মুসুল্লিদের সামনে বয়ান দিয়ে থাকেন, এনজিও কর্মীরা নির্দিষ্ট সময়ে আন্তঃদলীয় বৈঠক পরিচালনা করে থাকেন। এ সকল ব্যক্তি এই সহায়িকার বিষয় সমুহ ধারাবাহিকভাবে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করবেন।

এছাড়া কিছু ব্যক্তি আছেন যারা বিভিন্ন কারণে স্বল্প সময়ের জন্য মানুষের সামনে যোগাযোগকারী হিসেবে উপস্থিত হন। যেমন- চেয়ারম্যান মেম্বার শালিস দরবারে, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব কর্তৃক ধর্মসভায় আলোচনা, শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক অভিভাবক সভায়, সরকারি, অসরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক যে কোনো আলোচনা সভায় সেই সকল ব্যক্তি এই সহায়িকার বিষয় সমুহ উপস্থাপন করবেন।

আলোচনার সময়সীমা

প্রতিদিনের আলোচনার সময়সীমা হবে ৩০ মিনিট। কোনো ভাবেই আলোচনাকে বিরক্তিকর পর্যায়ে নেয়া যাবে না।

উপস্থাপন কৌশল

উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সহায়ক প্রতিদিনের আলোচনার বিষয়টি পূর্বেই প্রথমে নিজ পাঠ করে আতস্থ করবেন। পরবর্তীতে বিষয়টি নিজের মতো করে প্রয়োজনে আঞ্চলিক ভাষায় তা উপস্থাপন করবেন। উপস্থাপনার সময় আলোচনার গুরুত্ব মানুষ যাতে অনুধাবন করেন সেই জন্য বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরবেন। উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সহায়ক নিচের বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন।

সময়	ঃ	নির্ধারিত স্বল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা শেষ করতে হবে।
ভাষা	ঃ	মানুষ সহজেই বুঝতে পারে তেমন ভাষায় আলোচনা করতে হবে।
সহজ সরল ব্যাখ্যা	ঃ	সহজে বোঝার জন্য খুব সহজ সরল ব্যাখ্যা দিয়ে আলোচনা করতে হবে।
প্রতিবার্তা	ঃ	আলোচনার বিষয়টি মানুষ বুঝেছে কিনা তা প্রশ্ন করে বুঝতে হবে।

উপস্থাপনের ক্ষেত্রসমূহ

১. বিভিন্ন পরিবারের উঠোন বৈঠকে

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উঁচু ক্লাসের আলোচনায়।

৩. মসজিদে জুম্মার নামাজের বয়ানে।

৪. এনজিওগুলির গ্রুপ মিটিংয়ে।

৫. সরকারি, অসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাসিক আলোচনায়।

৬. ধর্ম সভায়।

৭. বিবাহ অনুষ্ঠানে।

৮. ইউনিয়ন পরিষদে ভিজিডি কার্ড বিতরণে।

৯. বিশেষ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কোনো অনুষ্ঠানের জমায়েতে।

আলোচনার বিষয়

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	দুর্যোগ কি	
২.	দুর্যোগ কত প্রকার	
৩.	বন্যার কারণ	
৪.	বাংলাদেশে বন্যার প্রকারভেদ	
৫.	বন্যা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য	
৬.	নদীর পানি বৃদ্ধি দেখে শুনে বন্যার ভয়াবহতা বোঝার উপায়	
৭.	কেন প্রশমন, প্রতিরোধ নয় কেন	
৮.	প্রস্তুতি	
৯.	স্বাভাবিক সময়	
১০.	বন্যার কারণে আমাদের যা যা ক্ষতি হয়	
১১.	বন্যার কবল থেকে ক্ষয়ক্ষতি রোধে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা	
১২.	ভিটা বাড়িঘর রক্ষা	
১৩.	ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি সামগ্রী রক্ষা	
১৪.	গবাদি পশু পাখি রক্ষা	
১৫.	গবাদি পশু পাখির খাদ্য ব্যবস্থাপনা	
১৬.	গবাদি পশু পাখির রোগব্যাধি ও প্রতিকার	
১৭.	নিরাপদ পানি	
১৮.	পয়ঃ নিষ্কাশন	
১৯.	বন্যাজনিত রোধব্যাধি ও প্রতিকার	
২০.	ডায়রিয়া	
২১.	জ্বর	
২২.	সর্দি গর্মি	
২৩.	খোস-পাঁচড়া	
২৪.	সাপ পোকামাকড় থেকে রক্ষা	
২৫.	কৃষি উপকরণ ও শস্যবীজ চারা সংরক্ষণ	
২৬.	মৎস্য সম্পদ রক্ষা	
২৭.	খাদ্য সংরক্ষণ	
২৮.	মহিলা ও শিশুদের সমস্যা এবং সমাধান	
২৯.	আশ্রয়কেন্দ্রের সমস্যা	
৩০.	রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ	
৩১.	বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ	
৩২.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ	
৩৩.	মৃতের সৎকার	
৩৪.	শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ	
৩৫.	বৃক্ষরোপন	
৩৬.	পরিবেশ রক্ষা	
৩৭.	বন্যার পূর্বে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে করণীয়	
৩৮.	বন্যা চলাকালে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে করণীয়	
৩৯.	বন্যা পরবর্তীতে পারিবারি ও সামাজিক ভাবে করণীয়	

দুর্যোগ কি

দুর্যোগ অর্থ প্রকৃতি বা মনুষ্যসৃষ্ট অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে কোন ঘটনা যাহার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা আক্রান্ত এলাকার গবাদি পশু ,পাখি ও মৎস্যসহ জনগোষ্টির জীবন,জীবিকা,স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পদ,সম্পত্তি ও পরিবেশের এইরুপ ক্ষতি সাধন করে অথবা এইরুপ মাত্রায় ভোগান্তির সৃষ্টি করে ,যাহা মোকাবেলায় ঐ জনগোষ্টির নিজস্ব সম্পদ,সামথ্য,সক্ষমতা যথেষ্ট নয় এবং যাহা মোকাবেলার জন্য ত্রাণ এবং বাহিরের যে কোন প্রকারের সহায়তা প্রয়োজন হয়।

দুর্যোগ কত প্রকার

দুর্যোগ দুই প্রকার যথা- প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানুষের সৃষ্টি বা কৃত্রিম দুর্যোগ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিবরণ

বন্যা, সাইক্লোন, খরা, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প, সুনামি, জলোচ্ছাস, টর্নেডো, নদী ভাঙ্গন, দাবানল, অগ্ন্যুৎপাত, শিলাবৃষ্টি, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি

মানুষের সৃষ্টি বা কৃত্রিম দুর্যোগের বিবরণ

যুদ্ধ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্ভিক্ষ, সন্ত্রাস, পরিবেশ দূষণ, অগ্নিকান্ড, দুর্ঘটনা, অধিক জনসংখ্যা, খাদ্য সংকট প্রভৃতি।

বাংলাদেশের বন্যা

বন্যা আমাদের দেশের একটি প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশের প্রত্যেকটি বড় নদীর উৎস বাংলাদেশের বাইরে। বাংলাদেশের নদী দিয়ে যে পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয় তার শতকরা ৯৫ ভাগ পানি বাংলাদেশের সীমানার বাইরের।

আমরা জানি, অধিক বৃষ্টিপাতই বন্যার প্রধান কারণ। কিন্তু বাংলাদেশে যদি অধিক বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবু বন্যা হতে পারে। কারণ হিমালয়ের বরফ গলা পানি, নেপাল ও ভারতের উত্তরাঞ্চলের অতি বৃষ্টির পানির ফলে বাংলাদেশের বন্যা হবেই। এ বন্যা প্লাবিত করে বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চল। বিনষ্ট হয় ফসল, ক্ষতিগ্রস্থ হয় সড়ক, জনপথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। পানির স্রোতে ভেসে যায় ঘরবাড়ি, নদী ভাঙ্গনে বিলীন হয় শত শত গ্রাম ও হাজার হাজার একর আবাদী জমি। কাজেই আমাদের বন্যা এবং বন্যার সঠিক কারণ জানা দরকার। এটাও জানা দরকার যে শুধুমাত্র বাংলাদেশের বৃষ্টিপাতে বাংলাদেশে বন্যা হয় না।

বন্যা (Flood):

সাধারণভাবে বন্যা বলতে বুঝায় অস্বাভাবিক পানির প্রবাহ, যা প্লাবণমুক্ত ভূমিকে প্লাবিত করে এবং জান ও মালের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। সাধারণত বর্ষা মৌসুমে (আষাঢ়-শ্রাবণ) আমাদের দেশের নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পায়। তবে পানি বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ বন্যা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বর্ষার পানি জীবন বা সম্পদের কোন ক্ষয়ক্ষতি না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাকে বন্যা বলতে পারি না। যখন বর্ষার পানি জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি করে এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন ব্যাহত করে তখন আমরা তাকে বন্যা বলি। অর্থাৎ, বর্ষা+ক্ষয়ক্ষতি=বন্যা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বন্যাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়:

- আকস্মিক বন্যা (Flash Flood) : এ ধরণের বন্যা পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলীয় নদী এলাকায় দেখা দেয়। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো হঠাৎ করে পানির উচ্চতা বেড়ে যায়। পানি প্রবাহের বেগ বেশি থাকার ফলে সম্পদ আর ফসলাদির প্রচুর ক্ষতি হয়। এ জাতীয় বন্যা এপ্রিল-মে মাসে হয়ে থাকে।
- বৃষ্টিপাতজনিত বন্যা (Rain Flood) : বর্ষা মৌসুমে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাপক বৃষ্টি পাতের ফলে এ ধরণের বন্যার সৃষ্টি হয়। কারণ স্থানীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অনেক সময় বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন করতে সক্ষম হয় না। এজাতীয় বন্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে হয়ে থাকে।
- প্রধান প্রধান নদীর মৌসুমী বন্যা (Seasonal Flood of Main Rivers) : বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই বিভিন্ন নদীতে পানি বাড়তে শুরু করে। গঙ্গা, ব্রক্ষপুত্র ও মেঘনা তিনটি নদীর সর্বোচ্চ সীমা মিলিত হলে বন্যা প্রকট আকার ধারণ করে। এ জাতীয় বন্যা জুলাই-সেপ্টেম্ববর মাসে হয়ে থাকে।
- জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যা (Flood due to Storm Surge) : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে অনেক নদী মোহনা, জোয়ার প্লাবিত সমতল ভূমি ও নিম্ন দ্বীপাঞ্চল বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস জীবন ও সম্পদের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। এ জাতীয় বন্যা এপ্রিল-অক্টোবর মাসে হয়ে থাকে।

বন্যার প্রধান কারণসমূহ :

- উত্তরের উজান দেশগুলো থেকে আসা প্রচুর পানি (প্রায় ৯৫ ভাগ পানি) ভাটির দেশ বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়ে।
- দেশের প্রধান তিনটি নদী অববাহিকায় একসঙ্গে পানি বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ বৃষ্টিপাতের সংমিশ্রণ।
- অল্প সময়ে অধিক পানির চাপ।
- নদী, খাল, জলাশয়ের তলদেশ ভরাট হয়ে যায়।
- নদী পথের গতি পরিবর্তন হওয়া।
- নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া ।
- পানি প্রবাহে/নিষ্কাশনে বাঁধা।
- যথোপযুক্ত বাঁধের অভাব।
- অপরিকল্পিত বাঁধ/রাস্তা নির্মাণ।
- উজানের বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাওয়া।
- অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও দ্রুত নগরায়ন।

বন্যা ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চল

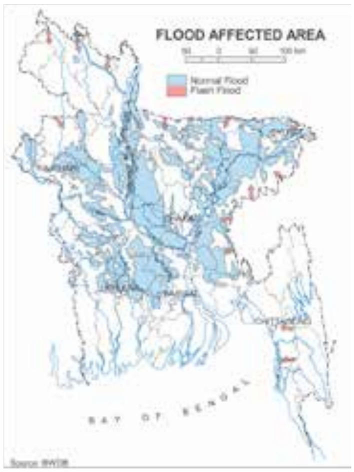

- বাংলাদেশের প্রায় ৪০টি জেলা বন্যার জন্য ঝুঁকিপ্রবণ
- দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চল মৌসুমি বন্যার জন্য ঝুঁকিপ্রবণ। যেমন কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারিপুর, শরিয়তপুর ইত্যাদি।
- অন্যদিকে দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চল আকস্মিক বন্যার জন্য ঝুঁকিপ্রবণ। যেমন- সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ইত্যাদি।
- এছাড়াও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা অতিরিক্ত জোয়ারজনিত বন্যার জন্য ঝুঁকিপ্রবণ।

বন্যা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য

- বন্যাকালিন সময়ে বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত বন্যা বুলেটিন নিয়মিত ভাবে পড়ুন। বন্যার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বন্যার গতি প্রকৃতি অনুধাবন করুন এবং জনসাধারণকে সচেতন করতে সহায়তা করুন।
- কোনো স্থানে একদিনে ৫০ মিলিমিটার বা অধিক বৃষ্টিপাত হলে সে জায়গায় বৃষ্টিজনিত বন্যার সৃষ্টি হয়।
- কোনো স্থানে একনাগাড়ে ১০ দিন ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হলে সে জায়গায় বৃষ্টিজনিত বন্যা হয় যা ১০ দিনের অধিক কাল থাকার সম্ভাবনা দেখা দেয়। নদীর পানিপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্যের ওপর নির্ভর করে বৃষ্টিজনিত বন্যার স্থায়িত্ব।
- বিপদসীমার ৫০ মিলিমিটারের নিচে পানি সমতলের অবস্থানকাল স্বাভাবিক বন্যা হিসেবে বিবেচিত হয়।
- বিপদসীমার ৫০ মিলিমিটার নিচু থেকে শুরু করে বিপদসীমার ৫০ মিলিমিটার ওপর পর্যন্ত পানি সমতলের অবস্থানকে অস্বাভাবিক বন্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- স্বাভাবিক বন্যা থেকে অস্বাভাবিক বন্যায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকালে পানি সমতল বিপদসীমা পর্যন্ত পৌচার সময়কে প্রাথমিক বন্যার প্রস্তুতিকাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- বিপদসীমার ৫০ মিলিমিটার ওপরে পানি পৃষ্ঠের অবস্থানকে দুর্যোগপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- চর এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের বর্হিভূত এলাকার জন্য ওপরের বন্যা পরিস্থিতির অবস্থা একধাপ বেশি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ স্বাভাবিক বন্যাকে অস্বাভাবিক বন্যা এবং অস্বাভাবিক বন্যাকে দুর্যোগপূর্ণ বন্যা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
- মোটামুটি ভাবে আপনার হাতের এক আংগুল সমান দেড় সেন্টিমিটার হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
- মিলিমিটার মানে ১ সেন্টিমিটারের দশ ভাগের এক ভাগ।

বন্যার সংকেত ও নদীর পানি বৃদ্ধি দেখে শুনে বন্যার ভয়াবহতা বোঝার উপায়

দুর্যোগ সংকেত: দুর্যোগ সতর্ক সংকেতের অর্থ হলো কোন একটি দুর্যোগের আঘাত হানার সম্ভাবনা সম্পর্কে আগামভাবে ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠীকে জানানো। যাতে করে ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠী আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করার মাধ্যমে ঐ দুর্যোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে এমন বিষয়গুলোর ঝুঁকি কমিয়ে আনতে পারে। যেমন– জীবনের ঝুঁকি কমাতে পারে, ফসলের ঝুঁকি কমাতে পারে, গবাদি পশু-পাখির ঝুঁকি কমাতে পারে ইত্যাদি।

দুর্যোগ সংকেতের প্রয়োজনীয়তা

নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্য বাংলাদেশে অভিযোজনের আলোকে সতর্ক সংকেতের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম–

- ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বাংলাদেশ একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঝুঁকিপ্রবণ।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে বন্যা, নদী ভাঙন, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা দিন দিন বাড়ছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মানুষের নেই।
- বাংলাদেশে দরিদ্রতার কারণে ব্যাপক জনগোষ্ঠী ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় বসবাস করে।
- প্রয়োজনীয় আশ্রয়কেন্দ্রের অভাব।
- পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে দুর্যোগ সতর্ক সংকেত ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠীকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়।

বন্যা সতর্ক বার্তার নমুনা

সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি আজ ০৮ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার ২০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় এই পানি আরও ১০ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার ১০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বিপদসীমা

সাধারণত যে সীমায় পানি উঠলে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই সীমাকে বিপদসীমা বলা হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা থেকে বিভিন্ন স্থানের অবস্থান এবং ভূমির গঠনের (উচ্চ ও নিম্ন) ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন স্থানের বিপদসীমা বিভিন্ন রকম হবে

বিপদসীমার ৫০ সেন্টিমিটার বা এক হাত ওপরে

বিপদসীমার এক হাত বা ৫০ সেন্টিমিটারের ওপরে পানি বৃদ্ধি পেলে দুর্যোগপূর্ণ বন্যা বলা হয়।

বিপদসীমার ওপরে এক হাত বা ৫০ সেন্টিমিটারের মধ্যে পানি উঠলে তখন অস্বাভাবিক বন্যা বলা হয়।

বিপদসীমা

বিপদসীমার ৫০ সেন্টিমিটার বা এক হাত নিচ থেকে বিপদসীমা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে পানি বৃদ্ধির সময়কালকে জীবন ও সম্পদ রক্ষার “প্রস্তুতি কাল” বলা হয়।

বিপদসীমার ৫০ সেন্টিমিটার বা এক হাত নিচ

বিপদসীমার ৫০ সেন্টিমিটার বা এক হাত নিচে পানি অবস্থান করলে তখন স্বাভাবিক বন্যা বলা হয়।

স্থানীয় বিপদসীমা নির্ধারণের কৌশল

বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী প্রতিটি পরিবার ও মানুষ সহজেই বলতে পারেন কোন স্তরে বা উচ্চতায় পানি উঠলে তাদের নিজ এলাকা বা পরিবার ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখিন হয়। সাধারণত স্থানীয় ক্ষয়ক্ষতির আলোকে পানির ঐ উচ্চতাকে স্থানীয় বিপদসীমা বলা হয়। এ ধরণেরবিপদসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত ধারাবাহিকভাবে যে কাজগুলো করা প্রয়োজন তা হচ্ছে

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করে দৃষ্টান্ত হিসেবে এমন একটি স্থানকে চিহ্নিত করা যে স্থানটি সবার পরিচিত এবং এলাকার সবাই দৈনন্দিন জীবনে সেই স্থানটিকে কম বেশী পর্যবেক্ষণ করে থাকে। যেমন কোন হাট বাজার, মসজিদ, স্কুল, ব্রিজ কালভার্ট অথবা কোন বড় গাছ।

দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত স্থানটির সন্নিকটে ঘরের খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয় এমন ১০ থেকে ১২ ফুট লম্বা একটি পাকা পিলার স্থাপন করা।

- এবারে এলাকার জনগণের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা নির্ধারিত ঐ স্থানের কোন স্তরে পানি উঠলে এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি শুরু হয়। পানির ক্ষতিকারক সেই স্তরটি চিহ্নিত করার পর ঐ স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থাপন করা পাকা পিলারে লাল রং দিয়ে প্রথমে বিপদসীমা চিহ্নিত করা। চিহ্নিত লাল দাগ থেকে পিলারের উপরের অংশ পর্যন্ত লাল রং করে দেয়া।
- পরবর্তীতে যেখান থেকে লাল রং শুরু হয়েছে সেখান থেকে কমপক্ষে দুই হাত পরিমাণ নীচে হলুদ রং দিয়ে আরেকটি দাগ দেয়া। লাল এবং হলুদের মধ্যবর্তী দুই হাত পরিমাণ অংশকে পুরোপুরি হলুদ রং করা।
- যেখান থেকে হলুদ রং শুরু হয়েছে সেখান থেকে পিলারের নীচের পুরো অংশকে সবুজ রং করে দেয়া।
- লাল রঙে পানি থাকার অর্থ বিপদ, হলুদ রঙে পানি থাকার অর্থ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সবুজ রঙে পানি থাকার অর্থ নিরাপদ।

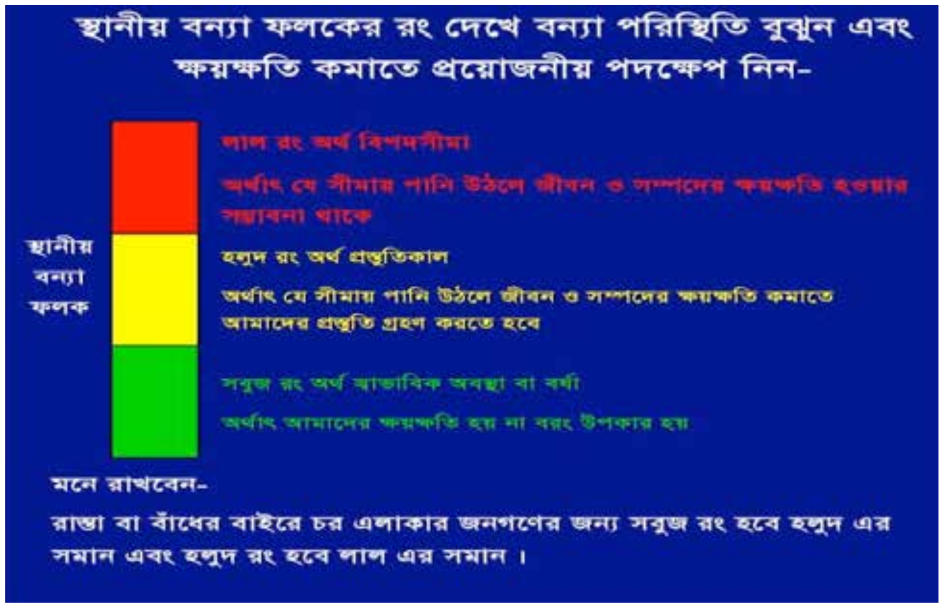

সেন্টিমিটারের মাপকে স্থানীয় জনগণ বুঝতে পারে এমন পরিমাপে রূপান্তরের কৌশল

গ্রামের মানুষ এখনও সেন্টিমিটার মিলিমিটার বোঝে না। তবে স্থানীয়ভাবে পানি বাড়া বা কমার সূচক হিসেবে ইঞ্চি, আঙুল, বিঘৎ, আধা হাত বা এক হাত সাধারণত মানুষের কাছে খুবই পরিচিত। সাধারণত এক হাত সমান প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার বা ১৮ ইঞ্চি। সুতরাং ২৫ সেন্টিমিটার পানি বাড়া বা কমার অর্থ আধা হাত, এক বিঘৎ বা ৯ ইঞ্চি পানি বাড়া বা কমা। এইভাবে সহজেই সেন্টিমিটারকে স্থানীয় বোধগম্য পরিমাপে রূপান্তর করা যায়।

আশ্রয়কেন্দ্র/উচু এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়া

আশ্রয়কেন্দ্র/উচু এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় যাওয়ার প্রস্তুতি এবং সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ

কেন প্রশমন, প্রতিরোধ নয় কেন

প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে বন্যা এ অঞ্চলের নিত্য সঙ্গী। বন্যার কারণে প্রতি বছর দেশে জীবনহানি এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির এই চরম সময়েও মানুষ বড় অসহায় এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কাছে। বিপুল অর্থ খরচে হয়ত বন্যাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু সেই অর্থ বাংলাদেশের নেই। আবার এ কথাও সত্য ভৌগোলিক ভাবে বাংলাদেশের যেখানে অবস্থান সেখানে প্রতি বছর কম বেশি বন্যা হবেই। এর মাঝেই আমাদেরকে বাঁচতে হবে। ভাবতে হবে সহায় সম্বল নিয়ে বাঁচার কৌশল। মানুষ তার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা দিয়েই সেই কৌশল আয়ত্ব করেছে আর সেটি হলো যদি কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায়, তবে বন্যা থেকে জান মাল রক্ষা করা বা ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। সুতরাং যেহেতু আমরা বন্যাকে এই মুহূর্তে প্রতিরোধ করতে পারছি না, সেহেতু কিভাবে আমরা বন্যা থেকে আমাদের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে পারি সে ব্যাপারে ভেবে পদক্ষেপ নেয়া উচিত। প্রশমন অর্থ পদক্ষেপসমূহ যা কোনো বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি কমাতে পারে।

প্রস্তুতি

প্রস্তুতি হচ্ছে, কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার লক্ষে পূর্বের করণীয় কাজ বা পদক্ষেপ। অর্থাৎ কোনো একটি কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার জন্য কি করতে হবে, কখন করতে হবে, কি দিয়ে করতে হবে, কে করবে ইত্যাদি বিষয়ে পূর্বেই পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা। দুর্যোগে প্রস্তুতি শব্দটি আরো একটি অর্থ বহন করে। তা হলো সাবধানতা। অর্থাৎ নিশ্চিত ভাবে কোনো একটি বিপদ ঘটতে যাচ্ছে, সেই বিপদ থেকে জীবন এবং সম্পদ রক্ষার জন্য আগাম ভাবে যা করণীয় তাই প্রস্তুতি। যেহেতু প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা যায় না, সে কারণে আমরা যদি প্রকৃত অর্থে প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো সম্পন্ন করি তবেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আমরা আমাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে পারবো।

স্বাভাবিক সময়

স্বাভাবিক সময় বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছে, যখন দুর্যোগ বা বিপদ থাকে না সেই সময়টিকে। আমরা জানি, আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস অনুযায়ী সাধারণত ঃ বাংলার আষাঢ় থেকে সর্বোচ্চ আশ্বিন মাস পর্যন্ত বন্যা হয়ে থাকে। সুতরাং এই মাসগুলো ছাড়া বছরের অন্য মাসগুলোকে আমরা স্বাভাবিক সময় হিসেবে ধরে নিতে পারি। প্রস্তুতিমূলক কাজের জন্য সবচেয়ে আদর্শ সময় হচ্ছে এই স্বাভাবিক সময়। কারণ চূড়ান্ত মুহূর্তে কিছুই থাকে না। পরীক্ষায় পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া যেমন কোনো ছাত্র ভাল ফলাফল আশা করতে পারে না, তেমনি বন্যা মৌসুমের পূর্বে যদি প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তবে দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে ভাল ফল আশা করা যায় না। অথচ এ কথা সত্য যে, রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে পারিবারিক পর্যায় পর্যন্ত আমরা কেউ দুর্যোগের চিন্তাকে মাথায় রেখে স্বাভাবিক সময়কে কাজে লাগাই না। ফলে বরাবর আমাদের অনাকাঙ্খিত ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়।

বন্যার কারনে আমাদের যা যা ক্ষতি হয়

বন্যা আমাদের নিত্য সঙ্গী। প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময় বন্যা আমাদের আঘাত করবেই। তারপর আছে আকস্মিক বন্যার আক্রমণ। বাংলাদেশের প্রায় অনেক অঞ্চলই বন্যাপ্রবণ। বন্যা প্রতি বছর আমাদের জীবন ও সম্পদের অপরিসীম ক্ষতি সাধন করে থাকে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও সামগ্রিক উন্নয়ন প্রচন্ড ভাবে বাধাগ্রস্থ করে এই বন্যা। বন্যাকে যেহেতু প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় সে কারনেই ভাবতে হচ্ছে কিভাবে বন্যার কবল থেকে আমাদের জান মাল রক্ষা করতে পারি। বন্যার ফলে কি কি ক্ষতি হয় এবং এগুলোর ক্ষতি কমাতে করণীয়সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল।

- বাড়িঘর ভিটা
- ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি সামগ্রী
- গবাদি পশু-পাখি ও তার খাদ্য
- নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
- স্বাস্থ্যহানি
- কৃষি উপকরণ শস্যবীজ ও চারা
- নিরাপদ স্থানে গমন ও স্থানান্তর
- সংরক্ষিত খাদ্য

- বন্যা সতর্কীকরণ সংকেত
- মহিলা ও শিশুর সুবিধা
- আশ্রয়কেন্দ্র
- রাস্তাঘাট
- বাঁধ
- মৃতের সৎকার
- শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
- ফলজ ও বনজ সম্পদ
- মৎস্য সম্পদ
- সাপ পোকামাকড়ের প্রাণহানি
- আয় রোজগার বন্ধ ইত্যাদি।

বন্যার কবল থেকে ক্ষয়ক্ষতি রোধে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা

এ কথা সত্য যে, বন্যা সরাসরি আমাদের জীবন সংহারী নয়। তবে বন্যা আমাদের সহায়ক সামগ্রী, সম্পদ ও প্রাণীর মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে থাকে। ফলে মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন ও দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। যে কোনো দুর্যোগের কবল থেকে জীবন বাঁচানোই প্রথম এবং প্রধান কাজ। সে কারণে জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করার পরেই প্রশ্ন আসে কিভাবে আমাদের সম্পদ রক্ষা করতে পারি। আমরা আগে দেখেছি, বন্যার কারণে আমাদের কি কি সম্পদের ক্ষতি হয়। এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করবো, বন্যা মৌসুমের আগে ও মৌসুম চলাকালে আমরা কি কি পদক্ষেপ নিলে বন্যার হাত থেকে আমাদের সম্পদগুলোকে রক্ষা করা যাবে বা ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। নিচে তার কয়েকটি আলোচনা করা হলো। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নিম্নের আলোচনায় এই এলাকার মানুষ যারা প্রতি নিয়ত বন্যার সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকেন, তাদের অভিজ্ঞতাই তুলে ধরা হলো।

ভিটা বাড়িঘর রক্ষা

বন্যাজনিত সমস্যা

- অধিকাংশ ঘরবাড়ি ডুবে যায়
- বাড়ির ভিটা বন্যার পানির স্রোতে ভেঙ্গে যায়
- ঘরের খুঁটি পানিতে পচে নষ্ট হয়ে যায়
- ঘরের দেয়াল বা বেড়া পানিতে পচে নষ্ট হয়ে যায়

বন্যাকালিন সময়ে ভিটা রক্ষার উপায়

- ভিটার ভাঙ্গন রক্ষায় বাড়ির চারপাশে বেড়া দিয়ে তার মধ্যে আমন ধানের খড় (যা পানি ঢেউয়ের সাথে জমি থেকে উঠে আসে) ফেলে দেয়া।
- ভিটার চারপাশে বাঁশের শক্ত চাটাই দিয়ে তার মধ্যে বিভিন্ন আবর্জনা, খরকুটা ও কাঁচা ধান গাছ ফেললে ঢেউ ভিটায় আঘাত করতে পারবে না।

- ভিটার কোনো অংশে ভাঙ্গন দেখা দিলে সাথে সাথে সেই স্থানে ভাঙ্গন প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- বন্যা এলাকায় আমন ধানের আবাদ ভাঙ্গন রোধে অত্যন্ত সহায়ক।

সমস্যা সমাধানে স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- যথা সম্ভব উঁচু জায়গায় বাড়ি তৈরি করা।
- বাড়ি নিচু থাকলে মাটি কেটে ভিটা উঁচু করা। (গত বন্যার উচ্চতাএবং আগাম বন্যার সম্ভাব্য উচ্চতা মাথায় রেখে)
- বাড়ির চারপাশে গাছ লাগানো।
- বাড়ির চারপাশে ঢেউ প্রতিরোধ করার জন্য ঢোলকলমি, কাশিয়া, দুর্বাঘাস ও অন্যান্য ভাঙ্গন প্রতিরোধক গাছ লাগানো।
- বিগত বন্যায় বাড়ির ভিটার ক্ষত স্থান মাটি কেটে ভরাট করা।
- ঘরের চালা বর্ষার আগেই মেরামত করা।
- বন্যার আগেই ঘরের বেড়া ও চালা শক্ত করা এবং মজবুত বাঁধন দেয়া।
- প্রয়োজনে ঘরের দুর্বল খুঁটিগুলো বদলিয়ে নতুন খুঁটি লাগাতে হবে।
- বন্যাকালিন সময়ে ভাঙ্গন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সামগ্রী জোগাড় করে রাখা যেমন- বাঁশ, দা, বাঁশের চাটাই, ভাঙ্গা টিনের টুকরা ইত্যাদি।
- আমন ধান চাষের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা।

ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি সামগ্রী রক্ষা

বন্যাজনিত সমস্যা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্যার পানিতে ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়ার কারণে বন্যাপ্রবণ এলাকার মানুষের ব্যক্তিগত (পরিধেয়, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ব্যবহারের জিনিসপত্র ইত্যাদি) এবং গৃহস্থালি সামগ্রীর (আসবাবপত্র, পারিবারিক ব্যবহারের জিনিসপত্র ইত্যাদি) ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে।

বন্যাকালিন সময়ে গৃহস্থালি সামগ্রী রক্ষার উপায়

- পানি আসার আগেই দলিলপত্র ও অন্যান্য দরকারি কাগজপত্র সুরক্ষিত স্থানে স্থানান্তর করা ভাল।
- বন্যার সময় হাড়ি পাতিল বস্তায় ভরে ঘরের চালার সাথে বেঁধে রাখা অথবা চাতালের ওপর তুলে রাখা।
- ঘরের মধ্যে উঁচু তৈরি করে তার ওপর অন্যান্য গৃহস্থালি সামগ্রী রাখা।

সমস্যা সমাধানে স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- বাড়ি যাতে না ডোবে সেই ব্যবস্থা নেয়া। (বাড়ি উঁচু করণ)
- জরুরি মুহুর্তে কোথায় ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি সামগ্রী স্থানান্তর করা উচিৎ তা স্থির করে রাখা।
- মাচা বানানোর সামগ্রী যেমন- বাঁশ, দা, দড়ি ইত্যাদি জোগাড় করে রাখা।
- ঘরের চাতালকে মজবুত করা।
- জিনিসপত্র ভরে উঁচুতে বেঁধে রাখা যায় এমন বস্তা সংগ্রহ করে রাখা।

বন্যাজনিত সমস্যা

বন্যাপ্রবণ এলাকার অধিকাংশ মানুষ হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল, ভেড়া, মহিষ ইত্যাদি প্রতিপালন করে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পশু সম্পদ তাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায়। আর এই পশু ও পাখি সম্পদ দিয়ে বন্যাপ্রবণ এলাকার মানুষের দুঃখ কষ্টেরও শেষ নেই। বন্যাকালিন সময়ে রোগ-ব্যাধি, খাদ্য সমস্যা এবং রাখার সমস্যা মানুষকে দিশাহারা করে দেয়।

বন্যাকালিন সময়ে গবাদি পশু পাখি রক্ষার উপায়

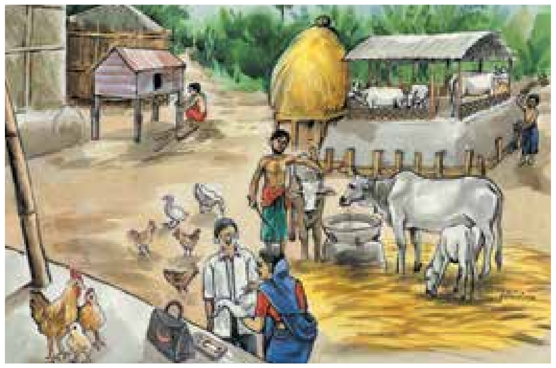

- বন্যার সময় গবাদি পশু বেড়ি বাঁধ বা অন্য কোনো উঁচু স্থানে স্থানান্তর করা।
- গরু-ছাগল রাখার স্থানকে বিভিন্ন ডালপালা গাছ-গাছড়া এবং কলাগাছ কেটে উঁচু করা এবং তার ওপরে গরু-ছাগল রাখা।
- বন্যার সময় খুঁটি দিয়ে হাঁস মুরগির ঘর উঁচু করা, প্রয়োজনে উঁচু মাচা তৈরি করে তার ওপরে হাঁস মুরগি রাখার ব্যবস্থা করা।
- পানিতে যাতে পড়ে না যায় তার জন্য মুরগির পা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা উচিত।
- অতিরিক্ত বন্যায় উঁচু স্থানের অভাব থাকলে কলাগাছের ভেলা তৈরি করে তার ওপরে ছাগল ও ভেড়া রাখা যায়।

সমস্যা সমাধানে স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- বাড়ি যদি উঁচু থাকে তবে বন্যাকালিন সময়ে পশু-পাখি নিয়ে মানুষের বিপদ কম হয়। এই জন্য বাড়ি উঁচুকরা উচিত।
- সম্পূর্ণ বাড়ি উঁচু করা সম্ভব না হলে মাটি কেটে গবাদি পশুর থাকার জায়গা উঁচু করা।
- টিন ও কাঠ দিয়ে হাঁস মুরগির ঘর তৈরি করা, যাতে বন্যার সময় সহজে সেটা বহন করা যায়।
- বন্যাকালিন সময়ে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল স্থানান্তর করতে হলে, পূর্বেই সেই স্থান চিহ্নিত করে রাখা।
- মাচা তৈরির প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন- বাঁশ, দা. দড়ি ইত্যাদি জোগাড় করে রাখা।
- বাড়িতে বেশি করে কলাগাছ লাগানো।
- বন্যাকালিন সময়ে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ইত্যাদি রক্ষা করা খুবই কষ্টকর হলে, বন্যা আসার আগেই এগুলি বিক্রি করে নগদ অর্থ ব্যাংকে রাখা ভাল। বন্যার পরে ঐ অর্থ দিয়ে আবারও হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল কেনা যেতে পারে।

গবাদি পশু পাখির খাদ্য ব্যবস্থাপনা

বন্যাজনিত সমস্যা

বন্যাকালিন সময়ে রাস্তাঘাট, মাঠ, চারণভূমি বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে বন্যাপ্রবণ এলাকায় ব্যাপক পশুপাখির খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্যাপ্রবণ এলাকার মানুষ এই সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। ফলে প্রতি বছর বন্যায় দেশে প্রচুর গবাদি পশুপাখি খাদ্যের অভাবে মারা যায়। যা বন্যাপ্রবণ এলাকার মানুষকে অর্থনৈতিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ করে।

বন্যাকালিন সময়ে গবাদি পাখির খাদ্য ব্যবস্থাপনার উপায়

- খড়, কচুরিপানা, কলাগাছ, কাশিয়া, বিভিন্ন গাছের পাতা, গমের ভুসি, ভুট্টা, প্যারার ভুসি, খৈল, চালের কুড়া, ভাত, কাড়ি, খড় ঝাড়া ধান ইত্যাদি গবাদি পশু-পাখির খাদ্য হিসাবে বন্যাকালিন সময়ে ব্যবহার করা যায়।
- উঁচু স্থানে খড়ের পালা দেয়ার চেষ্টা করা যাতে পশুর খাদ্য বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা যায়।
- চালের কুড়া, ভাত, কাড়ি, খড় ঝাড়া ধান ইত্যাদি মাটির পাতিল, হাড়ি অথবা বস্তায় করে মাচা বা ঘরের উঁচুতে সংরক্ষণ করা যায়।
- সাইলাস পদ্ধতিতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করা, যা বন্যাকালিন জরুরি প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করে।

বন্যাকালিন সময়ে গবাদি পশু পাখির খাদ্য ব্যবস্থাপনায় স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- বাড়ি উঁচুকরণ
- সম্পূর্ণ বাড়ি উঁচু করা সম্ভব না হলে মাটি কেটে গবাদি পশুর খাদ্য সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট স্থান উঁচুকরণ।
- গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন গাছ যেমন-কাইসা, কলাগাছ ইত্যাদি বাড়ির চারপাশে লাগানো।
- হাঁস-মুরগির জন্য চালের কুড়া, গমের কুড়া, কাড়ি ধান ইত্যাদি সংরক্ষণ করা।
- সংরক্ষণের জন্য পাতিল, হাড়ি, বোতল বা বস্তা আগে থেকে জোগাড় করে রাখা।
- মাচা তৈরির প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন- বাঁশ, দা, দড়ি ইত্যাদি জোগাড় করে রাখা।

গবাদি পশু পাখির রোগ- ব্যাধি ও প্রতিকার

বন্যাজনিত সমস্যা

বন্যাকালিন সময়ে গরু, ছাগল, মহিষের খুরা রোগ, পেট ফোলা, পাতলা পায়খানা, গলা ফোলা, না খাওয়া, পায়ে এবং মুখে ঘা হওয়া ইত্যাদি রোগ হয়। এ ছাড়াও হাঁস-মুরগির বসন্ত, কলেরা, ঝিমানো চুনা পায়খানা, কৃমি ইত্যাদি রোগ হয়। এ সমস্ত রোগের কারণে বন্যাপ্রবণ এলাকায় প্রতি বছর হাজার হাজার গবাদি পশু-পাখির মৃত্যু হয়।

বন্যাকালিন সময়ে গবাদি পশু পাখির রোগ-ব্যাধি ও প্রতিকারের উপায়

- রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য পশু ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত।
- খুরা রোগ থেকে রক্ষার জন্য শুকনা জায়গায় গরু রাখা। গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল যাতে বন্যার পানিতে না দাঁড়িয়ে থাকে তার ব্যবস্থা নেয়া।
- সরকারি, অসরকারি সংস্থার পশু ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ এবং পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া।
- এলাকায় প্রচলিত ঘরোয়া চিকিৎসা ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়া। (যেমন- বন্যাপ্রবণ এলাকাতে গরুর পায়ে ঘা হলে, আম ও জামের পাতা তার সাথে ১২ গাছের ১৩ ছাল এক সাথে পানির সাথে অনেক সময় ধরে জ্বাল দিয়ে হালকা কুসুম গরম পানি গরুর পায়ে ঢালা। পাতলা পায়খানা হলে, গাবের রস, ভাতের মাড়, শুকনা মরিচ, আদার রস, পিয়াজের রস ব্যবহার করা, ডালিম গাছের পাতা।)

বন্যাকালিন সময়ে গবাদি পশু পাখির রোগ ব্যাধি ও প্রতিকারে স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর জন্য বন্যার আগেই প্রতিষেধক ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করা।
- গবাদি পশুপাখি থাকার স্থান উঁচু করা।

- সরকারি, অসরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় পশু ডাক্তারের কাছ থেকে পশু পাখির রোগ ব্যাধিতে কি করণীয় সে সম্পর্কে জেনে রাখা।
- প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ঘরে রাখা।
- বন্যাকালিন সময়ে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ইত্যাদির রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ করা খুবই কষ্টকর হলে, বন্যা আসার আগেই এগুলি বিক্রি করে নগদ অর্থ ব্যাংকে রাখা ভাল। বন্যা পরে ঐ অর্থ দিয়ে আবারও হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল কেনা যেতে পারে।

নিরাপদ পানি

বন্যাজনিত সমস্যা

বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে বন্যার সময় নিরাপদ পানীয় জল প্রাপ্তি অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। বন্যাকালিন যতগুলো রোগব্যাধি হয়ে থাকে তার অধিকাংশের জন্য দায়ী হলো নিরাপদ পানীয় জল। নিরাপদ পানি বলতে কেবল পানীয় জলকে বোঝায় না, একই সাথে গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত পানিকেও বোঝায়।

বন্যাকালিন সময়ে নিরাপদ পানি প্রাপ্তি

- কষ্ট করে হলেও টিউবওয়েলের পানি সংগ্রহ করা।
- ঘরে সব সময় অতিরিক্ত পাইপ রাখা যাতে বন্যায় টিউবওয়েল ডুবে গেলে পাইপ জোড়া দিয়ে টিউবওয়েল উঁচু করা সম্ভব হয়।
- যদি টিউবওয়েল উঁচু করা সম্ভ না হয় তবে পলিথিন দিয়ে টিউবওয়েলের মুখ শক্ত করে বেঁধে রাখতে হবে যাতে বর্ষা বা বন্যার পানি ভিতরে ঢুকতে না পারে।
- বন্যার কারণে কোনো ভাবেই নিরাপদ টিউবওয়েলের পানি সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ফিটকারি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট অথবা ফুটিয়ে পানি নিরাপদ করে নিতে হবে।
- গৃহস্থালির অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্যও টিউবওয়েলের পানি সংগ্রহ করতে হবে অথবা বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। বৃষ্টির পানি নিরাপদ।

বন্যাকালিন সময়ে নিরাপদ পানি প্রাপ্তির জন্য স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- টিউবওয়েল সব সময় উঁচু স্থানে স্থাপন করা।
- অতিরিক্ত ২/৩ ফিট পাইপ ঘরে সংগ্রহ করে রাখা।
- বন্যা মৌসুমের পূর্বেই ফিটাকারি এবং পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট সংগ্রহ করে রাখা।
- সরকারি এবং অসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং পানি বিশুদ্ধকরণের উপায়গুলি ভাল মতো জেনে নেয়া।
- বন্যা মৌসুমের পূর্বে জনস্বাস্থ্য বিভাগ অথবা নিকটস্থ এনজিও অথবা স্থানীয় টিউবওয়েল মেরামতকারীর সাথে আলোচনা করে এ বিষয়ে ধারণা নেয়া এবং মেরামত সামগ্রী ঘরে রাখা।
- বন্যা মৌসুমের পূর্বে এলাকার টিউবওয়েলগুলি নষ্ট থাকলে তা মেরামত করা।
- এলাকার টিউবওয়েলগুলি সমাজের সম্পদ তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সমাজের প্রতিটি মানুষের' এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করা।

পয়ঃ নিষ্কাশন

বন্যাজনিত সমস্যা

বন্যার সময় পয়ঃনিষ্কাশন আর একটি বড় সমস্যা। বন্যাকালিন সময়ে বন্যা কবলিত এলাকার অধিকাংশ পরিবারের পায়খানা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্যার পানিতে ভেসে যায়। স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশনের অভাবে নানা রকম রোগব্যাধির সংক্রমণ দেখা দেয়।

বন্যাকালিন সময়ে নিরাপদ পয়ঃ নিষ্কাশন

এ কথা সত্য পায়খানা যদি উঁচু জায়গায় না থাকে তবে বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যাকালিন সময়ে পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান খুবই কষ্টকর। বন্যাকালিন সময়ে সাধারণত মানুষ যেভাবে এ সমস্যার সমাধান করে থাকে তা নিম্নরূপ-

- ভেলায় চড়ে লোক চক্ষুর আড়ালে গিয়ে
- অস্থায়ীভাবে পায়খানা নির্মাণ করে
- বাঁশ দিয়ে ঝুলন্ত পায়খানা তৈরি
- যে কোনো প্রক্রিয়ার বন্যার পানিতে মল ত্যাগ

যা কোনো না কোনো ভাবে বন্যার পানিকে আরো দুষিত করে এবং নানা রকম পানিবাহিত রোগের জন্ম দেয়। সুতরাং বন্যাকালিন সময়ে সমস্যা সমাধানে উল্লেখিত চর্চাগুলি না করে বন্যার পূর্বেই উঁচু জায়গায় পায়খানা স্থাপন করা উচিত। (পায়খানা ডোবার সম্ভাবনা থাকলে)

অথবা প্রতিবেশির পায়খানা (যার পায়খানা ডুবে যায় নি) ব্যবহার করা উচিত (তার সাথে পরামর্শ করে)।

বন্যাকালিন সময়ে নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশনে স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- উঁচু স্থানে পায়খানা নির্মাণ করা যাতে সাধারণ বন্যায় ডুবে না যায়।
- সমস্ত বাড়ি উঁচু করা সম্ভব না হলে, শুধুমাত্র পরিবারের পায়খানাটি যাতে বন্যার পানির উচ্চতার চেয়ে বেশি উচ্চতায় স্থাপন করা যায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।
- এ ব্যাপারে সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ এবং নিকটস্থ এনজিও-র পরামর্শ এবং সহায়তা নেয়া।
- বন্যার পানিতে মল ত্যাগের ক্ষতিকারক দিকগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরা।
- শুধু মল ত্যাগই নয় মৃত পশুপাখি এবং আবর্জনা যাতে বন্যার পানিতে না ফেলে সে ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করা।

বন্যাজনিত রোগ- ব্যাধি ও তার প্রতিকার

বন্যাজনিত সমস্যা

বন্যাকালিন সময়ে বিভিন্ন কারণে পানি দূষিত হওয়ায় এবং আবহাওয়াজনিত কারণে বন্যা কবলিত অঞ্চলে নানা রকম রোগ- ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। রোগগুলির মধ্যে ডায়রিয়া, সর্দি, জ্বর, কাশি, মাথা ব্যাথা, চুলকানি, আমাশয়, চোখের পীড়া, হাতে পায়ে ঘা, মেয়েলি রোগ ইত্যাদি। বিগত বন্যাগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে না খেতে পেয়ে মানুষ মরেছে খুবই কম, বেশি মানুষ মরেছে রোগ ব্যধিতে তার মধ্যে ডায়রিয়া এবং কলেরা অন্যতম।

বন্যাকালিন সময়ে রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধে করণীয়

- খাওয়া এবং ব্যবহারের কাজে নিরাপদ পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- টিউবওয়েলের পানি না পাওয়া গেলে খাবার পানি ফিটকারি দিয়ে অথবা পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট দিয়ে অথবা ফুটিয়ে পান করতে হবে।
- চর্মরোগ প্রতিরোধে বন্যার পানিতে গোসল থেকে বিরত থাকা এবং বন্যার পানিতে অবস্থান না করা।
- বন্যার পানিতে মল ত্যাগ থেকে বিরত থাকা এবং মৃত পশুপাখি ও পচা আবর্জনা মাটিতে পুঁতে ফেলা।
- যথা সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, প্রয়োজনে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা।
- সরকারি, অসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখা।
- পল্লী ডাক্তার অথবা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া।
- ঘরে স্যালাইনের প্যাকেট রাখা অথবা ঘরে স্যালাইন তৈরির উপকরণ সামগ্রী রাখা।
- রোগীর অবস্থার চরম অবনতির পূর্বেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করা।

বন্যাকালিন সময়ে রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধে স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- বন্যাকালিন সময়ে নিরাপদ পানি প্রাপ্তির জন্য উঁচু স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন।
- উঁচু স্থানে পায়খানা স্থাপন।
- বন্যা মৌসুমের পূর্বেই পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ফিটকারি ও প্যাকেট স্যালাইন ঘরে রাখা।
- সরকারি, অসরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর কাছ থেকে বাড়িতে কিভাবে খাবার স্যালাইন তৈরি করা যায় তা জেনে রাখা এবং বন্যা মৌসুমের পূর্বেই স্যালাইন তৈরির সামগ্রী ঘরে রাখা।
- সাধারণ সর্দি কাশি জ্বরের ঔষধ সরকারি, অসরকারি প্রতিষ্ঠানের ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীর অথবা এলাকার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ঘরে রাখা।
- বন্যাকালিন সময়ে রোগীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে তার সমাধানে কি করা উচিত তা ভেবে দেখা।
- ডায়রিয়া প্রতিরোধের ক্ষেত্রে জনগণকে সচেতন করা।
- প্রতিটি বাড়িতে নানা ধরনের ফলের গাছ বিশেষ করে নারকেল গাছ ও কলাগাছ লাগানো।

ডায়রিয়া রোগী সম্পর্কে যা জানতে হবে

- রোগীর কতবার/ কতবেশি পরিমাণে পায়খানা হয়েছে
- রোগীর কতদিন থেকে পাতলা পায়খানা হচ্ছে
- মলের সাথে রক্ত যাচ্ছে কি না
- রোগী বমি করছে কি না, করে থাকলে কতবার
- পাতলা পায়খানার সাথে অন্য কোনো রোগ যেমন হাম, নিউমোনিয়া আছে কি না
- শিশু হলে সে বোতলের দুধ বা পানি খায় কি না
- গত ২৪ ঘন্টায় কতবার প্রস্রাব করেছে, প্রস্রাবের রং গাঢ় হলুদ না লাল

- মলের সাথে কৃমি পড়ছে কি না
- রোগী তৃষ্ণার্ত কি না

রোগীর যা দেখতে হবে

- রোগীর চামড়া ঢিলা (স্থিতিস্থাপকতা কম) হয়ে গেছে কিনা
- চোখ কি কোঠরাগত
- শিশুদের ক্ষেত্রে, মাথার চাঁদি/ তালু কি বসে গেছে
- শ্বাস-প্রশ্বাস কি গভীর এবং দ্রুত (মিনিটে ৪০ এর বেশি)
- নাড়ির গতি কি দ্রুত ও দুর্বল (মিনিটে ১০০ এর বেশি)
- জিহ্বা কি শুকনা
- রোগী কি অজ্ঞান বা তন্দ্রালু
- শরীরের তাপমাত্রা কি কম (ঠান্ডা হয়ে গেছে)

রোগীর জন্য যা করতে হবে

- রোগীর পানি স্বল্পতার মাত্রা দেখে খাবার স্যালাইন খেতে দিন। অল্প হোক বা মাঝারি হোক, সব ধরনের পানি স্বল্পতার জন্য প্রতিবার পায়খানার পর কমপক্ষে ১ গ্লাস খাবার স্যালাইন খেতে দিতে হবে। তবে পিপাসা থাকলে আরো বেশি পরিমাণে খেতে দিন। ২ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ১/৪-১/২ গ্লাস এবং ৩-১২ বছরের শিশুর জন্য ১/২ থেকে ১ গ্লাস প্রতিবার পায়খানার পর খেতে দিন।
- মারত্মক পানি স্বল্পতার জন্য খাবার স্যালাইন খেতে দিতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে হাসাপাতালে পাঠিয়ে দিন।
- বড়দের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক খাবার এবং প্রচুর তরল খাবার দিন। শিশুদের বুকের দুধ এবং সেই সাথে স্বাভাবিক খাবার দেবার ব্যবস্থা করুন।
- নিম্নলিখিত উৎসর্গ বা লক্ষণ থাকলে রোগীকে অতি সত্বর হাসপাতালে বা ডাক্তারখানায় পাঠিয়ে দিন-
  - রোগীর ক্রমাগত বমি হলে এবং খাবার স্যালাইন খাওয়ানো সম্ভব না হলে।
  - রোগী অচেতন বা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে।
  - ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোনো প্রস্রাব না হলে।
  - ৭২ ঘন্টা খাবার স্যালাইন দেয়ার পরও ডায়রিয়ার কোনো উন্নতি না হলে।
  - জ্বর বমি ও রক্তসহ ডায়রিয়া হলে।
  - পেট ফুলে গেলে।

বাড়িতে স্যালাইন তৈরির উপায়

- ডায়রিয়া হলে তিন আংগুলের এক চিমটি লবণ ও এক মুঠো গুড় আধা সের বিশুদ্ধ পানিতে ভাল ভাবে মিশিয়ে স্যালাইন তৈরি করে রোগীকে খাওয়ান। রোগীকে স্বাভাবিক খাবার খেতে দিতে হবে এবং শিশু হলে অবশ্যই মায়ের বুকের দুধ দিন।

- আধা সের বিশুদ্ধ পানিতে প্যাকেট স্যালাইন মিশিয়েও রোগীকে খাওয়াতে পারেন।
- মনে রাখবেন কোনো ধরনের গোলানো স্যালাইনই ছয় ঘন্টার বেশি রাখা যায় না। গরম করলে এর উপকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

লক্ষণীয়

দুর্যোগের সময় স্বাভাবিক সরবরাহ অনিশ্চিত থাকার কারণে অনেকে সংরক্ষণের তাগিদ অনুভব করেন। মনে রাখতে হবে নিয়মানুযায়ী পুরা প্যাকেট পানিতে গুলানো অত্যাবশ্যক।

যা করবেন না

- রোগীর স্বাভাবিক খাবার ও শিশুদের বেলায় বুকের দুধ বন্ধ করবেন না।
- ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ ব্যবহার করবেন না।
- বমি হলেও স্যালাইন খাওয়ানো থেকে বিরত থাকবেন না।

জ্বর

বন্যা বা জলোচ্ছাসের পরে অধিকমাত্রায় পানিতে ভিজলে শরীরে জ্বর আসতে পারে। তাছাড়া আশ্রয়স্থলে আশ্রয়গ্রহণকারী মানুষদের মাঝে হাঁচি কাশি ইত্যাদির সাহায্যে দ্রুত সংক্রমণকারী জীবাণু বাহিত রোগের কারণেও আশ্রয়গ্রহণকারী মানুষ জ্বরে ভুগতে পারে।

সাধারণ জ্বর

শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে তাকে জ্বর বলে। জ্বর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অসুখের উপসর্গ।

জ্বর হলে

শরীরের সাধারণ গড় তাপমাত্রা ৩৭° সেলসিয়াস (৯৮.৬° ফারেনহাইট)

যা দেখতে বা জানতে হবে

শরীরের তাপমাত্রা কত তা মাপতে হবে।

যা করতে হবে

- তাপমাত্রা বেশি থাকলে প্রচুর পরিমাণে পানীয় পান করতে পরামর্শ দিন।
- পাতলা চাদর/ কাঁথা / কাপড় দিয়ে শরীর ঢেকে দিন।
- শিশুকে বুকের দুধ এবং স্বাভাবিক খাবার খাওয়াতে বলুন।
- জ্বর ১০০° ফারেনহাইটের বেশি হলে কুসুম গরম পানি দিয়ে গা মুছিয়ে দিতে বলুন।
- প্যারাসিটামল ঔষধ দিতে হবে। যখনই জ্বর ১০২° ফারেনহাইটের বেশি হবে তখন পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ২টা বড়ি (৫০০ মিলিগ্রাম)। শিশুদের জন্য ৩-৪ ঘন্টা পর পর জ্বর দেখতে হবে। যদি জ্বর ১০০° ফারেনহাইটের বেশি হয় তবে নিচের নিয়মানুযায়ী ১২৫ মিলিগ্রাম/ ৫ মিলি লিটার প্রতি ৬০ মিলিগ্রাম প্যারাসিটামল সিরাপ দিন।

০১ বছর	১-৫ বছর	৫-১২ বছর
১/২ চামচ	১/২ - ১ চামচ	১-২ চামচ এই নিয়মে দিতে হবে।

জ্বরের কারণ জানতে এবং পরবর্তী চিকিৎসার জন্য রোগীকে ডাক্তারের কাছে পাঠান।

সর্দি- গর্মি

রোদ বা অত্যাধিক তাপের সাথে সাথে আর্দ্রতার কারণে, এমনকি অধিক জ্বরে সর্দি-গর্মি দেখা দিতে পারে।

যা দেখতে বা জানতে হবে

- অসুস্থ ব্যক্তি মাথা ব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করা এবং গরম লাগার কথা বলে কিনা
- অসুস্থ ব্যক্তি ছটফট করছে কিনা
- অসুস্থ ব্যক্তি দ্রুত জ্ঞান হারিয়েছে কিনা অথবা গভীর ভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে কিনা
- অসুস্থ ব্যক্তির শরীরের তাপ ৪০° সেলসিয়াস (১০৩° ফারেনহাইট) বা তার চেয়ে বেশি গেছে কিনা এবং চামড়া শুকনো ও চোখ-মুখ রক্তাক্ত হয়ে পরেছে কিনা
- তার নাড়ি সবল এবং সতেজ অথচ শ্বাসে অস্বাভাবিক শব্দ হয় কিনা

যা করতে হবে

- অসুস্থ ব্যক্তির শরীরের তাপ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামিয়ে আনা এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- অসুস্থ ব্যক্তিকে ছায়াময় ঠান্ডা জায়গায় সরিয়ে নিয়ে তার শরীরের কাপড় খুলে বা ঢিলা করে দিন। মাথা পায়ের থেকে উঁচুতে রাখুন।
- অসুস্থ ব্যক্তির জ্ঞান থাকলে তাকে কিছুতে হেলান দিয়ে রাখুন।
- জ্ঞান হারালে তার শ্বাসনালি খোলা রেখে শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকমত চলে কিনা তা পরীক্ষা করুন।
- অসুস্থ ব্যক্তিকে সম্ভব হলে বরফ-পানিতে ভেজানো ঠান্ডা চাদর জড়িয়ে দিন এবং চাদরটিকে ঘন ঘন ভিজিয়ে রাখুন। এই অবস্থায় তার শরীরের তাপমাত্রা ৩৮° সেলসিয়াসে (১০১° ফারেনহাইট) না নামা পর্যন্ত তাকে সরাসরি ফ্যানের নিচে রাখুন বা তার শরীরে বাতাস করে যান।
- তাপ কমে গেলে অসুস্থ ব্যক্তির শরীর থেকে ভেজা চাদর সরিয়ে শুকনা চাদর দিয়ে বা তাকে খালি গায়ে রাখুন।
- তাপ বাড়লে পুনরায় তাকে ভেজা চাদর জড়িয়ে বাতাস করার ব্যবস্থা নিন ও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

খোস-পাঁচড়া

যা করতে হবে

- খোস-পাঁচড়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন।
- গোসল করার সময় অবশ্যই সাবান ব্যবহার করবেন। তারপর নিমপাতা সিদ্ধ পানিতে লবণ মিশিয়ে গায়ে ঢালুন।
- খোস-পাঁচড়া আক্রান্ত রোগীর কাপড় চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র গরম পানিতে ধুয়ে ভালো করে রোদে শুকিয়ে নিন।
- খোস-পাঁচড়া দেখা যাওয়া মাত্রই নিকটস্থ ডাক্তারের সাহায্য নিন ও চিকিৎসা করুন।
- খোস পরিষ্কার করে সেখানে নিমপাতা বেটে লাগাতে পারেন।

সাপ পোকামাকড় থেকে রক্ষা

বন্যাকালিন সময়ে মাঠঘাট ডুবে যাওয়ার কারণে সাপের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। ফলে এই সময় বন্যা এলাকাতে সাপের কামড়ের আশংকা বৃদ্ধি পায়। বন্যাকালিন সময়ে বন্যাপ্রবণ এলাকায় মানুষের মৃত্যুর আরেকটি কারণ সাপের কামড়। সুতরাং এই বিষয়টি সম্পর্কে সবার সচেতন থাকা উচিত।

সাপে কাটা রোগীর যা দেখতে হবে বা জানতে হবে

- অসুস্থ ব্যক্তির দৃষ্টি ঘোলাটে এবং ঘুমঘুম হয় কিনা, মাথা ধর বা মাথা ঘোরা আছে কিনা
- তাঁর বমি বমি লাগে বা তিনি বমি করছেন কিনা
- ফুঁড়ে যাওয়ার মতো সরু জখম, রক্তপাতের সাথে ব্যথা আছে কিনা, জখমের জায়গা ফুলে গেছে কিনা
- শ্বাস নিতে কষ্ট হয় বা শ্বাস একবারে বন্ধ হয়ে গেছে কিনা
- বিষাক্ত এবং বিষহীন সাপের কামড়ের দাগের তফাত আছে। বিষাক্ত সাপের কামড়ের দুইটি বিষদাঁতের গভীর দাগ এবং কখনো কখনো সাধারণ দাঁতের হালকা দাগ থাকে। বিষহীন সাপের কামড়ে শুধু দুই সারি সাধারণ দাঁতের হালকা দাগ থাকে। বিষদাঁতের দাগ থাকে না। চামড়ার গভীরে রক্তক্ষরণ হয়।

যা করতে হবে

- অসুস্থ ব্যক্তিকে আশ্বাস দিন, বিষ যাতে শরীরে ছড়িয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা নিন। সাপ হাতে বা পায়ে কামড় দিলে কামড়ের জায়গার ওপরে চারদিকে কাপড় দিয়ে বাঁধন দিন। খুব শক্ত করে বাঁধা যাবে না। আধ ঘন্টা পরপর বাঁধন এক মিনিটের জন্য আলগা করে দিন।
- অসুস্থ ব্যক্তিকে শুইয়ে দিন ও তাকে নড়াচড়া করতে মানা করুন। সাপ পায়ে কামড়ালে একপাও হাঁটাচলা করা যাবে না। আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্ট্রেচারে করে বহন করুন।
- সাবান ও পানি দিয়ে জখম খুব ভাল করে ধুয়ে দিন।
- সাপে কামড়ানোর আধ ঘন্টার মধ্যে হলেও একটি পরিস্কার ছুরি আগুনের শিখায় জীবাণু মুক্ত করে নিন। এই ছুরি দিয়ে বিষদাঁতের দাগের মাঝ বরাবর এক সেন্টিমিটার লম্বা ও আধ সেন্টিমিটার চওড়া ও আধ সেন্টিমিটার গভীর করে কেটে দিন। আপনার মুখে বা দাঁতে ঘা না থাকলে পনের মিনিট ধরে বিষ চুষে নিয়ে থুথুর সাথে বের করে দিন।
- অসুস্থ ব্যক্তি জ্ঞান হারালে তার শ্বাসনালী খোলা রেখে শ্বাস পরীক্ষা করুন।
- অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। সম্ভব হলে যে সাপে কেটেছে সেটিকে জ্যান্ত বা মরা অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যান। কারণ চিকিৎসক সাপ দেখে তার বিষ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

যা করা যাবে না

সাপে কামড়ালে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে টোটকা চিকিৎসা কাজে লাগে না। ফলে তা ব্যবহার করবেন না।

কৃষি উপকরণ ও শস্যবীজ চারা সংরক্ষণ

বন্যাজনিত সমস্যা

বাংলাদেশ কৃষি ভিত্তিক দেশ। এদেশের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল ও কৃষি কাজের সাথে জড়িত। বন্যাপ্রবণ এলাকার কৃষকেরা প্রতি বছরই বন্যাজনিত কারণে অর্থনৈতিক ভাবে কমবেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। কৃষি কাজের সাথে জড়িত উপকরণ সামগ্রী এবং শস্যবীজ ও চারা বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারলে, তারা পুনরায়

কৃষি কাজের মাধ্যমে তাদের বন্যাজনিত ক্ষতি পূরণে সক্ষম হয় এবং সাংসারিক সক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে পারে। সুতরাং বন্যাপ্রবণ এলাকার কৃষকেরা কিভাবে তাদের কৃষি উপকরণ শস্যবীজ ও চারা বন্যাকালিন সময়ে রক্ষা করতে পারে সেই বিষয়টি জেনে রাখা সবার জন্য খুবই প্রয়োজন।

কৃষি উপকরণ ও শস্যবীজ চারা সংরক্ষনে বন্যাকালিন সময়ে করণীয়

- কাস্তে, মাথাল, লাঙ্গল-জোয়াল, গরুর দরি, গরুর টোনা, মই ইত্যাদি ঘরের বেড়ার সাথে বা ঘরের চালাতে অথবা উঁচুতে বেঁধে রাখা।
- মেশিন, পাম্প, পাইপ ইত্যাদি মাচা করে উঁচুতে রাখা অথবা সময় মতো নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা।
- পাওয়ার টিলার, সেচ মেশিন ইত্যাদি ভারী যন্ত্রপাতী উঁচু কোনো জায়গা অথবা কোনো আত্মীয় বা প্রতিবেশীর বাড়িতে রাখা।
- শস্যবীজ মাচা করে বস্তায় বা অন্য কিছুতে প্যাকেট করে উঁচুতে সংরক্ষণ করা।
- বীজ ভাল করে রোদে শুকিয়ে রাখা, যাতে বর্ষার সময় নষ্ট না হয়।
- নিমপাতা রোদে শুকিয়ে গুড়া করে বীজের সাথে মিশিয়ে রাখা যাতে পোকায় ক্ষতি করতে না পারে।
- বর্ষার আগেই শস্যবীজ বস্তায় প্যাকেট করে চাতালে সংরক্ষণ করা।
- কলাগাছের ভেলা তৈরি করে তার ওপর বীজতলা করা অথবা বন্যায় ডোবে না এমন স্থানে বীজতলা করা
- বাঁশের খল্‌পা তৈরি করে তার মধ্যে কাচি, দা, পাচন ইত্যাদি রাখা।

কৃষি উপকরণ ও শস্যবীজ চারা সংরক্ষণে স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- বাড়ি যদি উঁচু থাকে তবে এ বিষয়টি নিয়ে খুব একটা সমস্যায় পরতে হয় না। তাই উঁচু জায়গায় বাড়ি বানানো উচিত। বাড়ি যদি নিচু থাকে তবে স্বাভাবিক সময়ে মাটি কেটে বাড়ি উঁচু করা উচিত।
- কৃষি উপকরণ এবং শস্য বীজ ও চারা সংরক্ষণের জন্য নিরাপদ উঁচু স্থান পূর্বেই চিহ্নিতকরণ
- বীজ রাখার জন্য বস্তা বা প্যাকেট জাতীয় জিনিস জোগাড় করে রাখা।
- মাচা বানানোর উপকরণ সামগ্রী জোগাড় করে রাখা।
- বাড়িতে বেশি করে কলাগাছ লাগানো।
- বন্যাকালিন সময়ে কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায় সে ব্যাপারে পরিকল্পনা করা।

মৎস্য সম্পদ রক্ষা

বন্যা কবলিত এলাকায় মানুষের পেশা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একটি অন্যতম পেশা মৎস্য চাষ। কিন্তু প্রতি বছর বন্যার কারণে মৎস্য চাষীগণ কমবেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকেন।

মৎস্য সম্পদ রক্ষায় বন্যাকালিন সময়ে করণীয়

- পুকুর পাড় ডুবে যাওয়ায় ভয় থাকলে নেট জাল পাড়ের চারপাশে টানায়ে দেয়া, যাতে মাছ বের হতে না পারে।
- বাঁশের বানা তৈরি করে পুকুরের চার পাশে ঘেরা দেয়া।
- মাটির ব্যবস্থা থাকলে পুকুরের চার পাশে চিকন করে বাঁধ দেয়া।

- কচুরিপানা দিয়ে পাড় উঁচু করা।
- পুকুরে ডালপালা ফেলা।
- বাইরের পানির চাপ ঠেকাতে পুকুরের পাড়ে মোটা পাইপ স্থাপন করা।

মৎস্য সম্পদ রক্ষায় স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- মাটি কেটে পুকুরের পার উঁচুকরণ।
- ঝুঁকি এড়াতে বন্যার পূর্বে মাছ বিক্রি করে দেয়া।
- ভাঙ্গন রোধে ঢোলকলমি কাশিয়া, ধনচিয়া গাছ পুকুরের চারপাশ দিয়ে লাগানো।
- জরুরি মুহূর্তে ঘেরা দেয়ার জন্য নেট জাল এবং বাঁশের বানা তৈরি করে রাখা।
- কিভাবে মৎস্য সম্পদ রক্ষা করা যায় সে ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করা।

খাদ্য সংরক্ষণ

বন্যকালিন সমস্যা

বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। অথচ বন্যার সময় খাদ্য ব্যবস্থাপনা যে কোনো পরিবারের জন্য একটি বড় সমস্যা। বন্যাপ্রবণ এলাকার অধিকাংশ ঘরবাড়ি বন্যাকালিন সময়ে ডুবে যাওয়ার কারণে পারিবারিক রান্না-বান্নার কাজে ব্যাপক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এমনও দেখা গেছে বাজার হাট না থাকায় এবং জ্বালানি সমস্যা ও রান্না উঁচু জায়গার অভাবে কোনো কোনো পরিবারকে রিলিফ হিসেবে সরবরাহকৃত শুকনা খাবার খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। বন্যাকালিন জরুরি খাদ্য এবং ঘরের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য এই দুইটির জন্য দুই ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। প্রতিদিনকার খাদ্য এবং অতিরিক্ত খাদ্য শস্য সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যদি পূর্ব থেকেই ভাবা না যায়, তবে বন্যার সময় এ সমস্যার সমাধান করা খুবই কঠিন।

খাদ্য সমস্যা সমাধানে বন্যাকালিন সময়ে করণীয়

- বন্যার জন্য ঘরে অবশ্যই অন্যান্য খাদ্য শস্যের পাশাপাশি কিছু শুকনা খাবার রাখা। যেমন- চাল, ডাল, মুড়ি, গুড়, আটা, ছাতু ইত্যাদি। শিশুদের জন্য বিস্কুট, গুড়া দুধ ইত্যাদি।
- বন্যার সময় তিন বেলা রান্না করা প্রায় অসম্ভব। সে কারণে নিয়মিত খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে দিনে একবার রান্না করে সারাদিন খাওয়া, প্রয়োজনে কম পরিমাণে খাওয়া। (শুধুমাত্র বড়দের জন্য প্রযোজ্য)।
- বস্তা, মাটির পাতিল, কলসি, ডাবর বা জালা, ব্যাগ ইত্যাদিতে জরুরি খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বন্যার পানি উঠে খাদ্যগুলো নষ্ট না করে।
- বন্যা আসার আগেই অতিরিক্ত খাদ্যশস্য বিক্রি করে ব্যাংকে টাকা জমা রাখা ভাল।
- বন্যার পানি যাতে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য নষ্ট করতে না পারে সেজন্য ঘরের মধ্যে উঁচু মাচা তৈরি করে সেগুলো তার ওপর রাখা যায়।
- অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সম্ভব হলে আত্মীয় বা প্রতিবেশীর বাড়িতে রাখা।
- রিলিফের খোঁজ-খবর রাখা এবং সরকারি, অসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদেরকে নিজেদের অবস্থা জানানো।

খাদ্য সমস্যা সমাধানে স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- বাড়ি যদি উঁচু থাকে তবে এ বিষয়টি নিয়ে খুব একটা সমস্যায় পরতে হয় না। তাই উঁচু জায়গায় বাড়ি বানানো উচিত। বাড়ি যদি নিচু থাকে তবে স্বাভাবিক সময়ে মাটি কেটে বাড়ি উঁচু করা।
- বন্যা মৌসুমের পূর্বেই স্থানান্তর যোগ্য আলগা চুলা তৈরি করে রাখা।
- বন্যা মৌসুমের পূর্বেই বন্যাকালিন সময়ের জন্য লাকড়ি জোগাড় করে রাখা।
- বন্যা মৌসুমের পূর্বেই চাল, ডাল, মুড়ি, গুড়, আটা, ছাতু, বিস্কুট, গুড়া দুধ ইত্যাদি ঘরে রাখা।
- সারা বছর বন্যাকালিন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পাত্রে চাউল, ডাউল সঞ্চয় করা।

মহিলা ও শিশুদের সমস্যা এবং সমাধান

বন্যাজনিত সমস্যা

বন্যার সময় অন্যান্য অসুবিধার পাশাপাশি মহিলা ও শিশুদের বিশেষ কিছু অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়। মহিলাদের অসুবিধাগুলির মধ্যে গৃহস্থালি কাজ, রান্নাবান্না, সন্তান-সন্ততি লালন-পালন, গর্ভাবস্থা, যাতায়ত, পয়ঃ নিষ্কাশন এবং মেয়েলি রোগ-ব্যাধি অন্যতম। শিশুদের ক্ষেত্রে পানিতে পড়ে যাওয়া, স্কুলে যেতে না পারা, বাড়িতে পড়াশোনা করতে না পারা ও খেলতে না পারা অন্যতম। আমাদের সমাজে নারী সংস্কৃতির কারণে মহিলারা সব সময়ই তাদের সমস্যা সবার কাছে তুলে ধরতে লজ্জা বা শংকা বোধ করে। তাই আমাদের উচিত তাদের এই সমস্যাগুলিকে অনুধাবন করে সমাধানে সহযোগিতা করা।

মহিলা ও শিশুদের সমস্যা এবং সমাধান বন্যাকালিন সময়ে করণীয়

- রান্নাবান্নার জন্য আগে থেকেই আলগা চুলা ও জ্বালানি জোগাড় করে রাখা।
- শুকনা খাবার ঘরে রাখা
- বাচ্চাদের সব সময় চোখে চোখে রাখা। সম্ভব হলে আত্মীয় বা প্রতিবেশীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া।
- সংসারের অন্যান্য কাজে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সাহায্য নেয়া।
- অতিরিক্ত বন্যার আগেই গর্ভবতী মহিলাদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও স্থানীয় ধাত্রীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।
- বাড়িতে সন্তান প্রসবের উপকরণ সামগ্রী জোগাড় করে রাখা।
- চলাফেরার জন্য ছোট ডিঙ্গি নৌকা বা কলাগাছের ভেলা প্রস্তুত রাখা।
- পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সহযোগিতায় অস্থায়ী পায়খানা নির্মাণ।
- মেয়েলি রোগব্যাধি প্রতিকারে স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক, ডাক্তার, সরকারি, অসরকারি সংস্থার স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নেয়া এবং সেই মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ।

মহিলা ও শিশুদের সমস্যা এবং সমাধান স্বাভাবিক সময়ে করণীয়।

- বন্যার পূর্বেই রান্নাবান্নার জন্য আলগা চুলা ও জ্বালানি জোগাড় করে রাখা।
- বন্যার পূর্বেই শুকনা খাবার ঘরে রাখা।
- ছেলে মেয়েদের সাঁতার শেখানো।

- গর্ভবর্তী মহিলাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় চিহ্নিত করে রাখা এবং স্থানীয় ধাত্রী ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।
- গর্ভবর্তী মহিলাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় চিহ্নিত করে রাখা এবং স্থানীয় ধাত্রী ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।
- বাড়িতে নিরাপদে সন্তান প্রসবের উপকরণ সামগ্রী জোগাড় করে রাখা।
- বন্যা আসার আগেই বাড়ির পায়খানা উঁচু করা।
- বন্যাকালিন সময়ে সম্ভাব্য মেয়েলি রোগ-ব্যধি প্রতিকারের জন্য বন্যার পূর্বেই স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক, ডাক্তার, সরকারি, অসরকারি সংস্থার স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নেয়া এবং সেই মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ।
- চলাফেরার জন্য ছোট ডিঙ্গি নৌকা তৈরি বা কলাগাছের ভেলা তৈরির জন্য বাড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কলাগাছ লাগানো।
- মহিলাদের বন্যাজনিত সমস্যার সমাধানে পুরুষেরা যাতে এগিয়ে আসে সে ব্যাপারে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা।

আশ্রয়কেন্দ্রের সমস্যা

বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে অধিকাংশ জায়গায় প্রাতিষ্ঠানিক কোনো আশ্রয়কেন্দ্র নাই। ফলে বন্যার সময় মানুষ যখন তার নিজ গৃহে বসবাস করতে পারে না তখন তাৎক্ষণিক আশ্রয় নেয়ার জন্য অনেকটা দিশেহারার মতো ছুটাছুটি করতে হয়। ঘূর্ণিঝড়ের কবল থেকে জীবন রক্ষার জন্য সাইক্লোনপ্রবণ এলাকায় অনেকগুলো ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে, বিপদে মানুস সেখানে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে সে রকম কোনো ব্যবস্থা না থাকার কারণে মানুষজন সাধারণত নিকটবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অথবা যে কোনো উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেয়। এখানে জায়গার সংকুলান না হলে লোকজন বাধ্য হয় বিভিন্ন হাট বাজার যেখানে সরকারি আটচালা রয়েছে সেখানে আশ্রয় নেয়। আবার অনেককে দেখা যায় বেড়ি বাঁধে অস্থায়ী ছাপড়া তুলে আশ্রয় নিতে। ফলে এ জাতীয় অপ্রাতিষ্ঠানিক আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে সমস্যার কোনো শেষ থাকে না। নিচে কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করা হলো।

- জায়গা সংকুলানের অভাব
- নিরাপদ পানির অভাব।
- থাকার জায়গার সমস্যা।
- প্রভাবশালীদের অধিক জায়গা দখলের প্রবণতা।
- জিনিসপত্র হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া।
- মহিলা বিশেষ করে অল্পবয়সীদের নিরাপত্তা।
- মহিলাদের গোসল এবং পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা।
- রান্না-বান্নার সমস্যা। বিশেষ করে জ্বালানি এবং চুলার সমস্যা।
- গর্ভবতীদের খুবই কষ্ট হয়।
- মানুষ ও পশু একত্রে বসবাস।
- স্বাস্থ্যগত সমস্যা।

বন্যাকালিন সময়ে করণীয়

- দুর্যোগকালিন সময়ে জরুরি ভিত্তিতে আক্রান্ত মানুষ, সরকারি, অসরকারি সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয়ে আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি গঠন করা। আশ্রয়কেন্দ্রের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানে কে কোন ভূমিকা পালন করবে তা স্থির করা।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানের জন্য যারা বেশি আক্রান্ত যেমন- মহিলা, শিশু, অসুস্থ ব্যক্তি এবং গর্ভবতী মহিলাদের প্রাধান্য দেয়া।
- সরকারি, অসরকারি সংস্থার সাথে যোগযোগ পূর্বক অথবা প্রয়োজনে নিজেদের উদ্যোগে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য টিউবওয়েল এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, প্রয়োজনে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ফিটকারি ও পর্যাপ্ত খাবার স্যালাইনের ব্যবস্থা রাখা।
- সরকারি, অসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ পূর্বক অথবা প্রয়োজনে নিজেদের উদ্যোগে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা রাখা।
- পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে গোষ্ঠীভিত্তিক রান্না খাবার ব্যবস্থা করা।
- আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করার জন্য রিলিফ প্রদানকারী ব্যাক্তি বা সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।
- প্রকৃত ব্যক্তি যাতে রিলিফ পায় সে ব্যাপারে রিলিফ প্রদানকারী ব্যাক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা।
- গবাদি পশুপাখিকে মানুষের থেকে পৃথক কোনো স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা।
- আশ্রয়কেন্দ্রে কোনো গর্ভবর্তী মহিলা থাকলে তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা।
- চুরি ডাকাতি রোধে ও মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য নিজেদের উদ্যোগে পাহারার ব্যবস্থা করা।
- নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখা।

মনে রাখতে হবে এটা কারো একার বিপদ নয়। এটা সবার বিপদ। সবাই মিলে এক সাথে এই বিপদের মোকাবেলা করতে হবে।

স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- দুর্যোগকালিন সময়ে জরুরি ভিত্তিতে সমস্যার সমাধানের জন্য এলাকার মানুষ, সরকারি অসরকারি সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয়ে আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি গঠন করা। বিগত বন্যার আশ্রয়কেন্দ্রের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে আগামিতে সমস্যার সমাধানে কে কোন ভূমিকা পালন করবে তা স্থির করা।
- এলাকার মানুষকে নিজ নিজ বাড়ি উঁচু করার ব্যাপারে উৎসাহী করা।
- এলাকাতে কোনো আশ্রয়কেন্দ্র না থাকলে, জরুরি মুহুর্তে বিকল্প আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে কোন কোন স্থানকে ব্যবহার করা যায় তা চিহ্নিত করে রাখা।
- জরুরি মুহুর্তে কোনো পরিবার কোথায় আশ্রয নেবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখা।
- সামাজিকভাবে আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির ব্যবস্থা নেয়া এবং এ ব্যাপারে সরকারি, অসরকারি অথবা ইউনিয়ন পরিষদের সাহায্য নেয়া।

রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ

বন্যাজনিত সমস্যা

বন্যার কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের শত শত কিলোমিটার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে কোন একটি অঞ্চলের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে উন্নত যাতায়ত ব্যবস্থা। ৮৬ হাজার গ্রাম নিয়ে বাংলাদেশ। এই গ্রামগুলির উন্নত যাতায়ত ব্যবস্থার ওপর বাংলাদেশর উন্নয়নও ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। তাই প্রতি বছর বন্যার কারণে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটগুলির যে ক্ষতি সাধিত হয়, তা শুধু গ্রামেই নয় দেশের অর্থনীতিকেও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এ ছাড়াও বন্যাকালিন সময়ে বিপর্যস্ত রাস্তাঘাট জনজীবনে আরো কষ্ট বাড়িয়ে দেয়। এক দিকে আক্রান্ত মানুষ যেমন নিরাপদ স্থানে সময় মতো যেতে পারে না, অপর দিকে আক্রান্ত মানুষকে দুর্যোগকালিন সময়ে সহযোগীতা করার জন্য সরকারি, অসরকারি উদ্যোগও ব্যাপকভাবে বাধার সম্মুখিন হয়। এ ছাড়াও বন্যা কবলিত এলাকায় দেখা গিয়েছে অতিরিক্ত বন্যায় মানুষ এবং তার সম্পদ রক্ষায় একটি উঁচু সড়ক আশ্রয় কেন্দ্রের ভূমিকা রেখেছে। আমরা জানি রাস্তাঘাট কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এটা সমাজ ও দেশের সম্পত্তি। যেহেতু উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন জড়িত, সেহেতু রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণে জনগণকে ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের মানসিকতায় এগিয়ে আসতে হবে।

বন্যাকালিন সময়ে করণীয়

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্যা কবলিত অঞ্চলের মানুষ এ বিষয়টির ব্যাপারে খুবই উদাসীন। তাদের বক্তব্য এ সমস্যাটি সংশ্লিষ্ট বিভাগের, এ ব্যাপারে তাদের কোনো দায় দায়িত্ব নাই। তবে খুবই অল্প পরিমাণ মানুষ যে উদ্যোগগুলি নিয়ে থাকে তা নিম্নরূপ।

- নিজেদের উদ্যোগে সরকারি, অসরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের জানানো।
- বিষয়টি সময় সাপেক্ষ হলে অথবা সরকারি, অসরকারি প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব না হলে নিজেদের উদ্যোগে চাঁদা তুলে সংস্কার করা।
- নিজেদের উদ্যোগে শ্রম দিয়ে বাঁশের সেতু তৈরি করা এবং রাস্তার ক্ষতি কমানোর জন্য ঝাড়ুট দেয়া।

স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- নিজেদের উদ্যোগে স্বাভাবিক সময়ে রাস্তার দুপাশ দিয়ে গাছ বা ঢোলকলমি লাগানো।
- রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।
- রাস্তাঘাট উন্নয়নে বা সংস্কারে সরকারি, অসরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা।
- সরকারি ভাবে ক্ষয়ক্ষতি জরিপের সময় সামাজিক ভাবে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো।

বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ

বন্যাকালিন সমস্যা

বন্যা কবলিত অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় বাঁধের গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু গ্রামেই নয় বাংলাদেশের এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর আছে যে সমস্ত শহরের অস্তিত্ব বাঁধের ওপর নির্ভরশীল। যেমন-রাজশাহী। এ ছাড়াও বাংলাদেশের অধিকাংশ বন্যা কবলিত এলাকায় অতিরিক্ত বন্যায় আক্তান্ত জনগণের আশ্রয় নেয়ার জন্য সরকারি, অসরকারি ভাবে কোনো আশ্রয়কেন্দ্র নাই। ফলে দেখা গিয়েছে এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষ চরম মুহুর্তে জীবন বাঁচানোর জন্য সহায় সম্পদ নিয়ে বাঁধে গিয়ে আশ্রয় নেয়। প্রতি বছর বন্যায় এই সমস্ত বাঁধের কমবেশি ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে কম

ক্ষতির সময় যদি মেরামতের পদক্ষেপ না নেয়া হয় তবে পানির চাপে সেই কম ক্ষতিটি বড় ক্ষতিতে পরিণত হতে বেশি সময় নেয় না। আরো যে সমস্ত কারণে বাঁধের ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে বাঁধের ওপর দিয়ে গাড়িঘোড়া চলাচল, বাঁধের দুই পাশে অস্থায়ী বসতি স্থাপন, অতিরিক্ত বৃষ্টিতে মাটির ক্ষয় ইত্যাদি। এ ছাড়াও বন্যাকলিন সময়ে আরো একটি সমস্যা দেখা দেয় সেটি হচ্ছে বাঁধের বাইরে অবস্থানকারী মানুষের বাঁধ কেটে দেয়ার প্রবণতা।

বন্যাকালিন সময়ে করণীয়

- বন্যাকালিন সময়ে বাঁধের কোনো অংশে ফাটল দেখা দিলে সরকারি, অসরকারি অথবা ইউনিয়ন পরিষদের ওপর নির্ভর না করে সামাজিক ভাবে ঐ ক্ষতিগ্রস্থ স্থান মেরামতের সিদ্ধান্ত নেয়া, যাতে আরো বেশি ক্ষতি না হয়। পাশাপাশি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারি, অসরকারি অথবা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের জানানো।
- বন্যাকালিন সময়ে তাৎক্ষনিকভাবে বাঁধের কোনো ক্ষতিগ্রস্থ স্থান মেরামতের জন্য বালির বস্তা, তালাই বা খলপা (বাঁশের চাঁচ) ও বাঁশ দিয়ে ক্ষতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া।
- বাঁধের যে অংশটি ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে সেই স্থানটিকে সবাই মিলে গুরুত্ব সহকারে নজরে রাখা।
- বাঁধের ভাঙ্গা জায়গাটি মাটি কেটে পূরণ করা।
- বাঁধ কেটে দেয়ার সম্ভাবনা থাকলে বাঁধের নিরাপত্তায় সামাজিক ভাবে পাহারার ব্যবস্থা নেয়া এবং প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা নেয়া।

স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- বাঁধ রক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এলাকা ভিত্তিক পৃথক পৃথক সামাজিক কমিটি গঠন।
- বাঁধ রক্ষার জন্য সকলে মিলে গাছ লাগানো।
- বিগত বন্যায় যদি বাঁধের কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তবে সে সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো।
- বাঁধ রক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।

আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ

বন্যাকালিন সমস্যা

বাংলাদেশের বন্যা অঞ্চলগুলিতে ঘূর্ণিঝড় অঞ্চলের মত সরকারি, অসরকারি সহায়তায় নির্মিত আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা খুবই কম। নগণ্য যে কয়েকটি আছে তাও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নানা সমস্যায় জর্জরিত। বন্যাকালিন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষায় যে সমস্যাটি সবচেয়ে বড় আকারে দেখা দেয় তা হচ্ছে বন্যার পানির স্রোতে আশ্রয়কেন্দ্রের ভাঙ্গন। বেশ কয়েকটি বন্যা অঞ্চলে দেখা গিয়েছে সরকারি, অসরকারি ভাবে আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে উঠলেও তা ৪/৫ বছরের মধ্যে ভেংগে গিয়ে আবার নদী গর্ভে চলে গিয়েছে। আরেকটি সমস্যা বন্যাকালিন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রে মানুষের অপরিকল্পিত বসবাস। ঘূর্ণিঝড় অঞ্চলের আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে মানুষ সর্বোচ্চ ১২ থেকে ২৪ ঘন্টার জন্য আসে। কিন্তু আমরা জানি অতিরিক্ত বন্যার পানি স্বাভাবিক ভাবে ১০ থেকে ১৫ দিন অবস্থান করে। ১৯৯৮ সালের বন্যায় এমনও দেখা গিয়েছে বন্যার পানি নিম্নে ৬০ এবং উর্দ্ধে ৭৫ দিন অবস্থান করেছে। এত দীর্ঘ সময় ধরে নিজ বাড়ির ছাদে বা মাচার ওপর পরিবার পরিজন নিয়ে অবস্থান করা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাই মানুষ তার গৃহস্থালি সামগ্রী, গবাদি পশুপাখি ইত্যাদি সহায় সম্পদ নিয়ে পরিবার পরিজনসহ বন্যাকালিন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রে অস্থায়ী বসতি স্থাপন করে। ফলে এই স্বল্প জায়গা অপরিকল্পিত ভাবে মানুষের ব্যবহারে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

বন্যাকালিন সময়ে করণীয়

- বন্যাকালিন সময়ে জরুরি ভিত্তিতে আশ্রয় কেন্দ্রের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা কমিটির সভা আয়োজন এবং সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের দায়-দায়িত্ব বন্টন।
- বন্যাকালিন সময় কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে ভাঙ্গন দেখা দিলে সামাজিক ভাবে সে ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা।
- অবস্থানকারী এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারকারীদের অপরিকল্পিত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানের ক্ষেত্রে নারী, শিশু, বয়স্ক, অসুস্থ এবং পংগুদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে শুধু মাত্র জীবন ও সম্পদ বাঁচানোর জন্য বন্যাকালিন সময়ে আমরা আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করে থাকি। এটা কোনো আরাম-আয়েশের জায়গা নয়। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়া উচিত।

স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- আশ্রয়কেন্দ্রের কমিটি গঠন করা।
- বন্যাকালিন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রের ভাঙ্গন রোধের জন্য মাটি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রী জোগাড় করে রাখা।
- বিগত বন্যায় আশ্রয়কেন্দ্রের ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকলে তা সংস্কার যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ।
- ভাঙ্গন রোধে আশ্রয়কেন্দ্রের চারপাশ দিয়ে ভাঙ্গন রোধক গাছ যেমন- ঢোলকলমি, কাশিয়া, বন, কলাগাছ ইত্যাদি লাগানো।
- মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষনে উদ্বুদ্ধ করণ।

মৃতের সৎকার

বন্যাজনিত সমস্যা

বন্যা কবলিত এলাকার বন্যাকালিন সময়ে সবচেয়ে মানবিক সমস্যা হচ্ছে মৃতের সৎকার। মানুষ হিসেবে একজন মৃত মানুষের শেষ কাজ শ্রদ্ধার সাথে এবং মর্যাদার সাথে শেষ হোক, এটাই আমরা চাই। কিন্তু বাস্তবতায় দেখা গিয়েছে অতিরিক্ত বন্যায় কোনো পরিবারের সদস্য মারা গেলে পরিবারের (মৃত ব্যক্তির) সদস্যদেরকে ভীষণ বিপদে পড়তে হয়। এমনও দেখা গিয়েছে দাফনের জায়গার অভাবে মানুষের লাশ কলাগাছের ভেলা বানিয়ে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। শুকনা জায়গার অভাবে নৌকায় জানাজার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। আবার এমনও দেখা গিয়েছে বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়া গোরস্থানের পানি নেমে যাওয়ার পর মানুষের হাড় কংকাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে।

বন্যাকালিন সময়ে করণীয়

- যত কষ্ট এবং যত দূরেই হোক না কেন মৃত ব্যক্তিকে উঁচু জায়গায় কোনো কবরস্থানে দাফন করা।
- একই ভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও কোনো উঁচু শ্মশানে দাহ করা।
- কবরের মধ্যে পানি উঠলে কলাগাছ দিয়ে তার ওপর লাশ রাখা, যাতে লাশ কবরের মধ্যেকার পানিতে ডুবতে না পারে।
- সমস্যাটিকে কারো ব্যাক্তিগত সমস্যা না করে সামাজিক ভাবে সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া।

স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- গোরস্থান ও শ্মশানের উন্নয়নে সামাজিক তহবিল গঠন।
- সামাজিক ভাবে এলাকার শ্মশান উঁচুকরণ।
- এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনে সরকারি, অসরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যোগাযোগ।

শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ

বন্যাজনিত সমস্যা

বন্যা কবলিত এলাকায় বন্যার কারণে এলাকার শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতি বছরই কম বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে এ সমস্ত এলাকার শিক্ষা কার্যক্রম দারুন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, সেই সাথে সমস্যার সম্মুখিন হয় ধর্মপ্রাণ বাঙালির প্রতিদিনের ধর্ম চর্চার। শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী শুধু নির্দিষ্ট এলাকারই না সমগ্র দেশের উন্নয়নের সহায়ক শক্তি। আর ধর্মীয় চর্চা হচ্ছে একটি জাতি বা গোষ্ঠীর সৎভাবে বা সততার সাথে জীবন যাপানের পথ প্রদর্শক। অপ্রিয় হলেও সত্য বন্যার হাত থেকে শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে সে ব্যাপারে আমরা কেউ ব্যক্তিগত ভাবে ভাবি না এবং সামাজিক ভাবে কোনো উদ্যোগও নেই না। অথচ এই শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বন্যাকালিন সময়ে বিকল্প আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে আমাদের জীবন রক্ষা করতে পারে, যদি আমরা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে উঁচু জায়গায় মজবুত ভাবে তৈরি করতে পারি এবং সামাজিক ভাবে তা রক্ষণাবেক্ষণ করি।

বন্যাকালিন সময়ে শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ করণীয়

- প্রাথমিক ভাবে এলাকাবাসী মিলিত হয়ে সংস্কারের চেষ্টা।
- ভাঙ্গন রোধে বাঁশ দিয়ে বেড়া দেয়া এবং বেড়ার মধ্যে কচুরিপানা, কাঁচা ধানের খড় ফেলা।
- সকলে মিলে মাটি কেটে রক্ষা করা।
- ক্ষতি সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদকে অবগত করা।
- জরুরি ভিত্তিতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মেরামতের জন্য চাঁদা তোলা।
- সরকারি, অসরকারি অনুদান প্রাপ্তির চেষ্টা
- সকলে মিলে মাটি কেটে জায়গা উঁচু করা হয়।

বন্যাকালিন সময়ে শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- যে সমস্ত শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নিচু জায়গায় অবস্থিত সেগুলিকে সামাজিক ভাবে উদ্যোগ দিয়ে উঁচুকরণ।
- নতুন শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে এলাকার অতীত ইতিহাস অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি পানির উচ্চতার রেকর্ড সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং সেই উচ্চতার চেয়েও বেমি উচ্চতায় প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণ করা।
- মাটি যাতে বন্যার পানিতে ভেংগে না যায় তার জন্য গাছ লাগানো।
- সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলিতে আধুনিক অর্থাৎ নাট-বোল্ট ও পার্টিশন পদ্ধতিতে জরুরি ভিত্তিতে স্থানান্তর যোগ্য শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ।
- শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণে সামাজিক কমিটি গঠন।
- শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণে সামাজিক তহবিল গঠন।

বৃক্ষরোপন

বন্যাকালিন সমস্যা

গাছের উপকারিতার কথা লিখে শেষ করার মতো নয়। আমাদের বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় উপাদান অক্সিজেন, যা আমরা পেয়ে থাকি গাছের কাছ থেকে। গাছ আমাদের ফল দেয়, ফুল দেয়, ছায়া দেয়, দেয়া জ্বালানী সমস্যার সমাধান। এ ছাড়াও আমাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার ক্ষেত্রেও গাছের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বন্যা এলাকাতে বন্যাকালিন সময়ে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে গাছ অত্যন্ত সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। বাঁশ এবং কলাগাছ বন্যা এলাকাতে বন্যাকালিন সময়ে মানুষের জীবন ও সম্পদ বাঁচাতে বিভিন্ন বাবে সহায়তা কলে। এ কথা বন্যা এলাকার প্রতিটি মানুষের। অথচ বাস্তবতায় দেখা গিয়েছে এদের অধিকাংশই বাড়ির আঙিনায় এ সমস্ত গাছ লাগায় না। ফলে বন্যাকালিন সময়ে অর্থের বিনিময়ে এ সমস্ত গাছ সংগ্রহের ব্যর্থ চেষ্টা করে।

বন্যাকালিন সময়ে গাছের প্রয়োজনীয়তা

গাছের নাম	কার্যকারিতা
আম, শিমুল, সিসা , মেহগানি	নৌকা বানানোর কাজে
কলাগাছ	চলাচল (ভেলা), বিকল্প গোখাদ্য, জরুরি সময়ে গোয়াল ঘর উঁচু করার কাজে বাড়ির উঠানে চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরির কাজে। বন্যাকালিন সময়ে কলাগাছের থোড় খেয়ে জীবন বাঁচিয়েছে এমন ঘটনা বন্যা এলাকাতে অহরহ। এছাড়া ও পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে কলার জুড়ি নেই।
কাইসা	ঘরের বেড়া, গোখাদ্য, স্রোত ঠেকানোর জন্য ঝড়ট দেয়া, জমিতে পলিমাটি আটকিয়ে রাখা।
ধৈঞ্চা	গোখাদ্য, জ্বালানি, পলি আটকানো।
বাঁশ	খুঁটি, জ্বালানি, মাচা ইত্যাদি নানাবিধ কাজের জন্য।

বৃক্ষরোপনের স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

বন্যার কবল থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় যে সমস্ত গাছ সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে, বন্যা কবলিত এলাকার মানুষ যাতে সেই সমস্ত গাছ ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগে রোপণ করে সে ব্যাপার সবাইকে উদ্বুদ্বকরণ।

পরিবেশ রক্ষা

দেশের বিগত বন্যাগুলিতে যে সমস্ত মানুষ মারা গিয়েছে তাদের অধিকাংশরই মৃত্যুর কারণ রোগ-ব্যাধি। এই সমস্ত রোগ-ব্যাধি সৃষ্টির প্রধান কারণ বন্যা উত্তর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে মৃত পশুপাখি, পচা গাছপালা আবর্জনা এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। সুতরাং সুস্থ জীবন যাপনের জন্য বন্যা উত্তর পরিবেশ রক্ষায় আমাদের করণীয় কি সে বিষয়টি বন্যা এলাকার প্রতিটি মানুষের জানা দরকার।

পরিবেশ রক্ষায় করণীয়

- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে মরা গাছপালা, মৃত পশুপাখি, আবর্জনা এক জায়গায় গর্ত করে পুঁতে ফেলা।
- ঘরবাড়ি দ্রুত পরিষ্কার করা।
- বাড়ির চার পাশে ব্লিচিং পাউডার ছিটানো।

- নতুন করে গাছপালা লাগানো।
- মাটি কেটে ঘরবাড়ি মেরামত এবং বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার করা।

পরিবেশ রক্ষায় স্বাভাবিক সময়ে করণীয়

- ব্যক্তিগত ও সামজিক পর্যায়ে 'পরিবেশ রক্ষায় মানুষের করণীয় কি' এ ব্যাপারে বিভিন্ন স্তরে আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি উদ্যোগ গ্রহণ।
- পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে ব্লিচিং পাউডার সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধকরণ।

বন্যার পূর্বে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে করণীয়

পারিবারিক করণীয়	সামাজিক করণীয়
• বাড়ির ভিটামাটি উঁচু করা এবং পুরাতন খুঁটি বদলে দেয়া	• সমাজের সবাই মিলে দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটি গঠন।
• গবাদি পশুর ভিটা উঁচু করা।	• শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ রক্ষার জন্য গ্রামের গণ্যমান্যদের সাথে যোগাযোগ।
• হারিকেন ম্যাচ ও জ্বালানি তেল সংরক্ষন করা।	• আশ্রয় শিবিরের জায়গা নির্ধারন করে রাখা।
• বাড়ির আশে পাশে কলাগাছ লাগানো।	• চিকিৎসালয় স্থাপন করার প্রস্তুতি।
• দুর্যোগের খবর পত্র পত্রিকা ও রেডিওর মাধ্যমে পারিবারিক ভাবে শোনা।	• আশ্রয় শিবিরের জন্য উঁচু স্থানে নলকূপ স্থাপন করা।
• টিউবওয়েলের অতিরিক্ত পাইপ সংগ্রহ রাখা।	• এলাকার মানুষজনকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার পরামর্শ দেয়া।
• শুকনা জ্বালানি কাঠ উঁচু স্থানে সংরক্ষণ করা।	• সবাইকে ডেকে মিটিং এর ব্যবস্থা করা।
• পশু পাখির খাদ্য উঁচু জায়গায় রাখা।	• দুর্যোগে কমিটির সদস্যদের সর্বদা সতর্ক থাকা।
• মাটির আলগা চুলা তৈরি করে রাখা।	• দুর্যোগের খবর সবাইকে পৌঁছে দেয়া।
• ফিটকারি, ঔষধ, খাবার স্যালাইন, কার্বলিক সাবান, পটাশ সংগ্রহে রাখা।	
• শুকনা খাবার সংরক্ষণ করা।	
• নৌকা বা ভেলার ব্যবস্থা রাখা।	
• বাঁশ সংগ্রহ করা।	
• ঢোলকলমি লাগানো।	
• কবরস্থানে উঁচু করা।	
• উঁচু স্থানে পায়খানা নির্মান।	
• বিগত বন্যার অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন করে প্রস্তুতি নেয়া।	

বন্যা চলাকালে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে করনীয়

পারিবারিক করণীয়

- ছোটদের নিরাপদ স্থানে নেয়া বা চোখে চোখে রাখা।
- হাঁস-মুরগি উঁচু স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা।
- গরু ছাগলের জন্য কচুরিপানা দ্বারা উঁচু স্থান নির্মাণ করা।
- আসবাবপত্রের জন্য মাচা তৈরি করে তার ওপর রাখা হয়।
- পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- মূল্যবান সম্পদ আত্মীয় বাড়ি রাখা।
- উঁচু চুলার ব্যবস্থা করা বা মাচার ওপর রান্না করা।
- জ্বালানি কাঠ উঁচু স্থানে রাখা।
- সংকেত চিহ্ন মোতাবেক পরিবারের সকলে সর্তক হওয়া।
- নৌকার ব্যবস্থা করে রাখা।
- সাঁকো তৈরি করা।
- পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা।
- স্রোতের হাত থেকে ভাঙ্গন রোধকল্পে বাড়ির ভিটার চারপাশে ঢোলকলমি দিয়ে ঝাড়ট তৈরি করা।
- কলাগাছের ভেলা বানানো।
- মালামাল উঁচু স্থান বা শিবিরে নেয়া
- এনজিও কর্মীদের সাহায্য নেয়া।
- প্রয়োজনে ঝুলন্ত পায়খানার ব্যবস্থা করা।
- খাদ্যদ্রব্য স্থানান্তর করা।
- বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা ও ফিটকারি ব্যবহার করা।
- শুকনো খাবার গ্রহণ করা।
- স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা।
- কেরোসিন, ম্যাচ ইত্যাদি হাতের কাছে রাখা।
- ডাকাত ও সাপ পোকার মাকড়ের উপদ্রব থেকে সজাগ থাকা

সামাজিক করণীয়

- বিপদে সবাইকে সাহায্য করা
- পারাপার ও চলাচলের ব্যবস্থা চালু রাখা।
- প্রতিদিন পানি বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা।
- রেডিও টিভি খোলা রাখার পরামর্শ দেয়া।
- কমিটির মাধ্যমে চাঁদা তুলে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা।
- দুর্যোগে কমিটির সাথে যোগাযোগ করা।
- দুর্যোগ চলাকালে খাদ্য সামগ্রী স্থানান্তর করতে যানবাহনের ব্যবস্থা করা।
- দুর্যোগে অসুখ না হওয়ার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখা।
- এনজিও কর্মীদের সাথে যোগযোগ করা।
- আশ্রয়কেন্দ্রে লোকজনদেরকে পৌছানোর ব্যবস্থা করা।
- বিপদগ্রস্তদের নিরাপদ স্থানে রাখা।
- গবাদি পশু-পাখি উঁচু স্থানে প্রেরণে সহায়তা করা।
- অসুখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।
- বাইরের সাহায্য সকলের মধ্যে বিতরণ করা।
- জীবন বাঁচানোর জন্য বাইরের সাহায্য আনার ব্যবস্থা করা।
- সংকেত চিহ্ন ব্যবহার করা।

বন্যা পরবর্তীতে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে করণীয়

পারিবারিক করণীয়	সামাজিক করণীয়
• নিজেদের বাড়ি মেরামত করা। • বাড়ির আবর্জনা পরিস্কার করা। • অন্যের বাড়িতে রেখে যাওয়া জিনিস নিয়ে আসা। • উন্নত বীজ সঠিক ভাবে রোপণ করা। • সরকারি, অসরকারি ঋণের টাকা সঠিক ভাবে কাজে লাগানো। • মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য সহায়তা করা। • স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা। • জমি আবাদের জন্য কৃষি ঋণ সংগ্রহ করা। • গাছপালা লাগানো। • সাহায্যের জন্য স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বারের সাহায্য নেয়া। • গোখাদ্য চাষাবাদ করা। • বাড়ির গর্ত ভরাট করা।	• ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা। • স্থানীয় চেয়ারম্যানকে গ্রামে ডেকে এনে ক্ষয়ক্ষতি দেখানো • থানা নির্বাহী অফিসারের সাহায্য নেয়া। • সবাইকে ডেকে মিটিং করা। • কমিটি গঠন করা। • সবাইকে সচেতন করা। • বাড়িঘর নতুন করার ব্যবস্থা করা • গাছ লাগানোর উপদেশে দেয়া। • সবজি চাষের উপদেশ দেয়া • টিউওয়েলের ব্যবস্থা করা। • পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা। • স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে ঔষধের ব্যবস্থা করা। • সরকারি সাহায্য দ্বারা পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা। • বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের উন্নতমানের ফসলের বীজ প্রদানের ব্যবস্থা করা। • আশপাশের পরিবেশ পরিস্কার করা। • রাস্তাঘাট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, শ্মাশানঘাট মেরামতের জন্য সরকারি ও অসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা। • ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করা। • সফল ভাবে জানমাল সম্পদ রক্ষা করতে পেরেছে এমন দৃষ্টান্ত সবাইকে জানানো।

প্রকাশনা:
বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

কারিগরি সহযোগিতা:
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস্ সেন্টার (বিডিপিসি)

অর্থায়নে : কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম
(সিডিএমপি২)

UKaid from the British people
European Union
NORWEGIAN EMBASSY
SWEDEN
Australian Aid
UNDP Empowered lives. Resilient nations